মূর্ছনা
==========
www.MurchOna.com
Archives of eBooks, Music & Videos
বইটি মূর্ছনা.com এর সৌজন্যে নির্মিত
==========
suman_ahm@yahoo.com

স্বপ্ন দেখছিল পার্থ। একটা লাল ফড়িং। ঈষৎ লালচে। পাখনা ক'খানায় লালের উপর কালো কালো ছোপ। উড়ছিল ফড়িংটা। এদিক-ওদিক। ওদিক-এদিক। উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছিল। উড়তে উড়তে আবার রাস্তার খুব কাছাকাছি নেমে আসছিল মাঝে মাঝে। নিচে জল। একটা খোয়া-ওঠা-গর্ত। তাতে জল। পতঙ্গটা সেই জল স্পর্শ করছিল।

আর তার মাথার ঠিক উপরে, স্ট্র্যাটোস্কিয়ার দিয়ে, পুব থেকে পশ্চিম দিকে উড়ে যাচ্ছিল একটা প্লেন। অদ্ভুত প্লেনটা। ফড়িংয়ের মতো হালকা তার ডানা। ফড়িংয়ের মতোই দেহ। তারও রঙ লাল। একটু হালকা লাল। যেন গোধূলির আবির-রঙ-আকাশের কিছুটা ভেঙে পড়েছে তার গায়ে। প্লেনটা উড়তে উড়তে রিয়াদের বাড়ির ছাদ পেরিয়ে, সরখেলদের তেলের মিল পেরিয়ে, দেবদারু গাছটার মাথায় উপর দিয়ে আড়ালে চলে গেল। আরেকবার দেখবে ভেবে দেবদারু গাছটার দিকে এগিয়ে গিয়েও প্লেনটাকে আর দেখতে পেল না পার্থ। আসলে দেখা হয়ে উঠল না। কারণ ঠিক তখনই একটা কাক কাছে কোথাও থেকে বেশ জোরেই ডেকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বাদবাকি কাকগুলোও চিৎকার জুড়ে দিল বিশ্রীভাবে। এমনভাবে চিৎকার করতে লাগল যে, ওদের ভিতরে যেন হঠাৎ-ই কোনও বড় ধরনের অঘটন ঘটে গেছে, সেই কাক-চিৎকারেই ঘুমটা ভেঙে গেল। চোখ মেলে তাকাল সে। দেখল, সকাল হয়ে গেছে। ঘরের ভিতরে যদিও আবছা অন্ধকার, তবু খোলা জানালা পথে বাইরের দিকটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। বেশ স্পষ্ট। আঁচের ধোঁয়ার গন্ধ নাকে আসছে। এফ. এম. বাজছে কাছেই কোথাও। আকাশে সূর্য উঠবে উঠবে ভাব।

আবহাওয়াটা আজ মৃদু ঠাণ্ডা। অথচ গতকাল রাতে ঘেমে ঘেমে ভিজে যাবার মতো অবস্থা। যেমন গরম, তেমনি যেন পাল্লা দিয়ে লোডশেডিং। অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমই আসেনি। বৃষ্টি এসেছিল বলেই কিছুটা স্বস্তি। ঝম ঝম করে বৃষ্টি পড়েছে। একটানা। অনেকক্ষণ। এখন আকাশটা পরিষ্কার, নীল। সর্বত্র মেঘমুক্তির চিহ্ন।

বিছানা থেকে উঠে পার্থ খেলা জানালাটার কাছে চলে এল। চোখ দু'টোয় এখনও জ্বালা জ্বালা ভাব। মুখে নিস্পৃহতা, কিছুটা সরলতাও। শরীরের ভিতরে উত্তাপের একটা চোরা স্রোত বইছে। কী খেয়াল হল, স্রোতটাকে ধরতে চাইল সে। মুখটাকে নিয়ে এল জানালার গ্রিলের খুব কাছ পর্যন্ত। মুখের ডান পাশটা দিয়ে স্পর্শ করল গ্রিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা মৃদু শিরশিরানি অনুভূতি মুখ বেয়ে, মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে চলে গেল নিচের দিকে। ভালো লাগা একটা আবেশের ভাব ছড়িয়ে গেল শিরায় শিরায়। মুখ তুলে আকাশের দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল লাল বলের মতো সূর্যটার হামাগুড়ি দিয়ে শূন্যে উঠে আসা। পার্থ অবাক হয়ে গেল দৃশ্যটির অভিনবত্বে। মুগ্ধতায় ভরে উঠল তার দু'চোখের দৃষ্টি। আবার পরক্ষণেই মনটা খারাপ হয়ে গেল। সূর্যের এভাবে উঠে আসা, এই সৌন্দর্য - এ সব একদিন হয়তো হারিয়ে যাবে এ-

পাড়া থেকে। যেমন হারিয়ে গেছে এখানকার অনেক কিছুই।

এ-পাড়াটাতে আজকাল চাকরিজীবীদের প্রাধান্য। আগেকার বাড়িগুলোর, মাথা ছাড়িয়ে এখানে সেখানে গড়ে উঠেছে সরকারি কোয়ার্টার, চাকরিজীবী-নিবাস। আরও কতকগুলো মাথা তুলবার অপেক্ষায়। সবই অবশ্য সরকার অধিকৃত জমিতে। অন্যান্য জায়গায় গড়ে উঠেছে নতুন নতুন বাড়ি, দু'একটা ফ্ল্যাটও। পার্থর বেশ মনে আছে, পাড়াটা একসময় এত ঘিঞ্জি ছিল না। খোলা মেলা কিছু জায়গা তখনও ছিল। খেলার মাঠও ছিল একটা। সরখেলদের সানবাঁধানো বড় পুকুরে সে সময় অনেক লোকে চান করত। নন্তু, অরণি, জীবন কিংবা বিনায়কদের সঙ্গে দল পাকিয়ে চিপ ফেলে কতদিন যে সে মাছ ধরেছে ওই পুকুর থেকে ! এখন যেখানে রিয়াদের বাড়ি, তারপরেই যে কোয়ার্টারটা, সেখানেই ছিল তাদের খেলার মাঠটা। মাঠের পশ্চিমে, রাস্তার ধারে, একটা বড় বেলগাছ বহুদিন ধরে বেড়ে উঠছিল। সে গাছে বেল ধরত না। পুজোর কাজেও ব্যবহার করা হত না তার পাতা। তবে দুরন্ত ছেলেগুলো গাছটাকে তাদের খেলার সঙ্গী করে নিতে ভুল করত না। আজ আর সে সবের কিছুই তেমন নেই। ভাবলে আজও বুকের মধ্যে একটু যেন কষ্ট অনুভব করে পার্থ। কোথায় যে হারিয়ে গেল ছেলেবেলার সেই সব স্মরণিকগুলো !

পার্থ জানালাটার কাছ থেকে সরে এল। কুলুঙ্গিতে, যেখানে শিল্ড-কাপগুলো রয়েছে, তার ঠিক ওপরে রবীন্দ্রনাথের একটা ছবি। পাশাপাশি পেলে আর মারাদোনার ছবি দু'টো। তারপরেই হাসি হাসি মুখে মা। মায়ের এই ছবিটা গত বছর বাঁধিয়ে নিয়েছে সে। এর আরও একটা কপি রাখা আছে অ্যালবামে। গতবারই সরস্বতী পুজোর দিনে নন্তুর ক্যামেরায় সে নিজেই তুলেছিল ফটোটা। কী সুন্দর যে দেখাচ্ছে মায়ের চোখ দু'টো, কী উজ্জ্বল ! হঠাৎ পার্থর মাথায় একটা খেলা চাপল। ছোটবেলায় দাদুর ছবির সামনে দাঁড়িয়ে যে রকমটা করত সে, সেরকমভাবে মায়ের ছবিটার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে একবার পুবে, একবার পশ্চিমে দ্রুত সরে সরে গেল। বসে পড়ল। লাফাল। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে এপাশে-ওপাশে দোলাল শরীরটাকে। তারপর হেসে ফেলল। মায়ের দৃষ্টি সব দিকেই। তুমি কি আমাকে এভাবে সব সময় চোখে চোখে রাখ মা ? সব সময় ? মাগো, তবে কেন তুমি তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে উঠছ না ! পার্থ হাত বাড়িয়ে মায়ের ছবিটাকে স্পর্শ করল। আর ঠিক তখনই সে শুনতে পেল বাইরে

দরজার টুক্ টুক্ - ঠক্ ঠক্ শব্দ করছে শান্তা।

- দাদা, অ্যাই ! এখনও ঘুমোচ্ছিস ? ওঠ। আজ প্র্যাকটিস আছে না তোর ?

পরক্ষণেই বাবার গলা, ডাকছিস কেন আবার ? থাকুক। শুয়েই থাকুক। কতক্ষণ ঘুমোতে পারে দেখা যাক। শুয়ে-বসেই তো দিন কাটছে নবাবের !

পার্থ সচকিত হল। রেগে গেছেন বাবা। নিশ্চয় আজ মন-মেজাজ ভালো নেই।

ঝট করে দরজার কাছে চলে এল সে। কান পাতল। এই ছোট্ট ঘরটার পাশেই বাথরুম। আজ যদি অফিস বন্ধ না থেকে থাকে তো বাবার এতক্ষণে বাথরুমে ঢোকার কথা।

কিন্তু কোনও শব্দ শোনা গেল না। চান করবার সময় জলের শব্দ কিংবা বালতি রাখা বা সরানোর শব্দ। কী বার আজ ? পার্থ দেওয়ালে টাঙানো ক্যালেন্ডারের দিকে তাকাল। বুধবার। আজ - না, আজ কোনও ছুটির দিনও না। বাবা কি তা হলে ছুটি নিয়েছেন আজ ?

বাবাকে দেখলে আজকাল কষ্ট হয় তার। এমন কিছুই বয়স হয়নি। অথচ দেখলে মনে হয় যেন ষাট পেরিয়ে গেছে। চুলে পাক ধরেছে। কপালের দিকটায় চুল উঠে গিয়ে কেমন যেন ন্যাড়া ন্যাড়া, চওড়া-কপালি ভাব। গায়ের সেই ফর্সা রঙের জৌলুস আর নেই। চামড়াও যেন ক্রমশ কুঁচকে যাচ্ছে। পার্থ অবশ্য জানে, অতিরিক্ত চিন্তার কারণে এরকমটা হয়। বাবার চিন্তা কি কম ! মেয়ে বড় হয়েছে। তার বিয়ের ভাবনা। মায়ের অসুখটাও কিছুতেই সারছে না। তাছাড়া তার একটা চাকরি --। বাবার জন্যে বুকের ভিতরে গভীর মমত্ববোধ যেন আঁকুপাঁকু করে উঠল। মনে মনে সে বলল, তোমার কষ্ট আমি বুঝি বাবা। আর ক'টা দিন আমায় সময় দাও, ক'টা মাস। চাকরি একটা ঠিকই জোগাড় করে নেব। মাখনদা বলেছে লিগের খেলায় ভালো খেলতে পারলে একটা না একটা চাকরি হবেই।

যতখানি সম্ভব শব্দ না করে দরজাটা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল পার্থ।

সামনে দাঁড়িয়ে শান্তা।

- বাব্বা, ঘুমোতেও পারিস তুই ! সেই কখন থেকে ডেকে যাচ্ছি --।

হাতের কাজ সারছিল শান্তা। বারান্দাটা পরিষ্কার করছিল।

- বাবা আজ অফিসে যায়নি ?

- না।

- ছুটি ?

- তুই কী রে ? কিচ্ছু খোঁজ খবর রাখিস না ! বাবার তো জ্বর এসেছে।

- জ্বর !

পার্থ কিছুটা যেন গুটিয়ে গেল। গতকাল সে বেশ রাত করেই বাড়িতে ফিরেছে। রাতের খাবারটা তার ঘরেই ঢাকা দেওয়া ছিল। খেয়ে উঠে বিছানায় গিয়ে শুতে না শুতেই ঘুম। মা কেমন আছে, বাবার কী খবর - খোঁজই নেওয়া হয়নি।

- আজ তো আবার তোর প্র্যাকটিস আছে ?

- হ্যাঁ। বলেই পার্থ কী একটা ভেবে আবার বলল, বাবাকে যদি ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হয়, তাহলে না হয় আজ আর প্র্যাকটিসে যাব না।

সঙ্গে সঙ্গে শান্তা বলে উঠল, থাক। ও কাজটা আমি খুব পারব। এখন তাড়াতাড়ি মুখটা ধুয়ে আয় দেখি। চা বসিয়েছি।

টুথ ব্রাশটা মুখে পুরে বাথরুমের কাছে চলে এল পার্থ। এসে দেখল খালিই। এবং দেখে একটু অবাক হল। দোতলা এই বাড়িটায় উপরে-নিচে মিলিয়ে তিন ঘর ভাড়াটে। তারা, দিনেশদারা আর এক অবাঙালি দম্পতি। কিন্তু বাথরুম দু'টো মাত্র। যে যার প্রয়োজন মতো যেখানে হোক কাজ সেরে নেয়। সুতরাং এই সকালে, এখন বাথরুম খালি পাওয়াটা বেশ ভাগ্যের ব্যাপার।

খুশি খুশি মনে এগোতে গিয়ে অবশ্য বাধা পেল সে।

- এই যে ব্রাদার, টয়লেটে না কি ?

পার্থ মুখ ফেরাল। দিনেশদা।

- আরে, দিনেশদা যে ! গুড মর্নিং।

- মর্নিং বটে। কিন্তু গুড কি না বলতে পারব না, ভাই। বলতে বলতে এগিয়ে এল দিনেশদা। মুখে কষ্ট কষ্ট ভাব।

- কেন ? কী হল আবার ?

- আর বোলো না। কাল রাত থেকে সেই যে আরম্ভ হয়েছে, তখন থেকে চলছে তো চলছেই।

- ডিসেন্ট্রি ?

- উ-হু। পাতলা।

পার্থ হেসে ফেলল।

তাতে দিনেশদার গলায় মৃদু অনুযোগ।

- হাসছ, ভাই ? কী করব বলো ! এই শালা ভেজালের যুগেই যা একটু পেটের ট্রাবল হচ্ছে আমার। নইলে নাইন্টিন এইট্টি সিক্সেও দেড়-দু'কেজি মাংস একা সাবড়ে দিয়েছি, ভাবতে পারো ! পেটে তখন নট নড়ন-চড়ন, নট কিস্যু। আর কাল ? কাল ওই দু'পিস কি তিন পিস বুঝলে ? ভাগের ভাগ মাত্র দুই কি তিন পিস খেয়েই পেটে ইঞ্জিন চলছে !

- ওষুধ খাননি ?

- খাইনি আবার ! ঘরে এক পাতা ইনো ছিল, তা খেয়েছি, মেট্রোজিল ফোর হানড্রেডও খেয়েছি। তারপরেও তো কমার লক্ষণ নেই। এদিকে তোমার বউদি আবার রেগে ফায়ার। আমার নাকি খুব নোলা, রয়ে সয়ে খাইনে...। আচ্ছা তুমিই বলো, এই অবস্থায় অফিসে যাওয়া যায় ?

- সে তো ঠিকই।

- তবে ! অফিসে বেরিয়ে পথে ঘাটে কোথায় কী হবে কেউ বলতে পারে ?

- বউদি কী বলছে ? অফিসে যেতে বলছে ?

- লোভ, বুঝলে, লোভ। ছুটি করলে এ সপ্তাহে বেনিফিটটা আর পাব না। কয়েক'শ টাকা লস। সেই ভয়েই...। আসলে কী জানো ভাই, দেখলাম তো অনেক, সব মেয়েরাই এরকম। টাকা ছাড়া তাদের কাছে মানুষের কোনও মূল্য নেই। তোমার বউদিও সেই গোত্রের।

- আর তুমি ? তুমি কী ? সাধু পুরুষ ? আ-হা-হা, কী এমন সাধু পুরুষ রে ! এক পয়সা যার মুরোদ নেই, তার আবার ফুটানি ! দিনেশদার কথা শেষ হতে না হতেই করকরিয়ে উঠলেন রমলা বউদি।

পার্থ কিছুটা অপ্রস্তুত। ঘর থেকে রমলা বউদি এসব কথা শুনছিলেন এতক্ষণ ! সে কিছুটা লজ্জাই পেল।

দিনেশদারও মানে লেগেছে। তাই তর্জন-গর্জনও স্বাভাবিক।

মুখ সামলে রমলা ! যা না তা মুখে আনলে কিন্তু ছেড়ে কথা বলব না - এই বলে রাখলাম।

- কী ? কী করবে তুমি ? মারবে ? মেরেই দ্যাখো না, গায়ে হাত দিয়ে দ্যাখো না একবার !

ঝড়ের পূর্বাভাস। বুঝে গেল পার্থ। প্রায়ই তো এরকম হয়।

সে তাড়াতাড়ি বলল, দিনেশদা, আপনি কি আগে যাবেন ? গেলে যেতে পারেন। আমি না হয় আপনার পরেই যাবক্ষণ।

কিন্তু রাগের তোড়ে তখন যেন সব ভুলতে বসেছেন দিনেশদা।

- না। তুমি যাও। আমি পরে দেখছি। বলে, সেখানে আর না দাঁড়িয়ে, এগিয়ে গেলেন নিজেদের ঘরের দিকে।

পার্থও আর সময় নষ্ট না করে ঢুকে গেল টয়লেট কাম বাথরুমে।

ভিতরে কোনও বাথটব নেই। ভাড়াবাড়ির বাথরুম তো ! একটা চৌবাচ্চা অবশ্য আছে। তার ভিতরে একটা পাইপ থেকে জল বেরিয়ে ভরে থাকে চৌবাচ্চাটা। যে পারে দরকার মতো বালতি ভরে জল নিয়ে কাজ সারে। তবে জল নিতে হয় মেপে মেপে। পার্থ অবশ্য পারে না অমন বাঁধা-ধরা হিসেবের মধ্যে চান করতে। বালতি তিনেক জল সে প্রায়শই খরচ করে ফেলে। তার জন্যে শান্তার কাছে মাঝে মাঝে কথা শুনতে হয়। তবু স্বভাব কি সহজে পালটায় !

আজও সে জলটা একটু বেশিই ব্যবহার করে ফেলল। করে আফসোসও হল তার। ইস, এতটা খরচ না করলে চলত। রমলা বউদি আজ নির্ঘাৎ শান্তাকে প্রকারান্তরে

কথা শোনাবে। তাছাড়া জলটুকু থাকলে শান্তা বা মায়ের কাজে লাগত। ওদের বোধহয় শেষপর্যন্ত জলে তেমন কুলায় না।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে আবার নিজের ঘরে চলে এল পার্থ। ভিজে চুলগুলো ভালো করে মুছে, চুল আঁচড়াতে গিয়ে, আগেই চোখ পড়ল তিন-চারদিন না কামানো দাড়িগুলোর দিকে। বিশ্রী লাগছে। অন্তত ফ্রেস তো লাগছেই না। কাটতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু এখন আর সম্ভবও না। চান করে এসেই দাড়ি কাটতে দেখলে মা রাগ করে। অতএব কী আর করা যাবে ! ভাগ্যিস কোয়েলের সঙ্গে দেখা হবে না আজ !

পার্থ জামা-প্যান্ট পরল। চুল আঁচড়াল। রোজকার ব্যাগটা গোছাল একটু। তারপর রান্না ঘরে এসে সামান্য কিছু মুখে দিয়ে চলে এল মায়ের ঘরে।

ঘরটা তেমন সাজানো-গোছানো নয়। আসবাবপত্রও দু'একটা মাত্র। ঘরের এক কোণে কাঠের ছোট একটা আলমারি। পাশেই কাঠের একটা সিন্দুক। বেশ বড়-সড় আর পুরনো। ঠাকুমার আমলের।

তবে আয়তনে এ-ঘরটা বেশ বড়ই। খাট-আলমারির জায়গাটুকু বাদ দিয়েও ফাঁকা জায়গা কিছুটা রয়ে গেছে। ওখানে মাদুর পেতে দু'তিনজন বেশ শোয়া যায় বা বসা যায়।

রোজকার মতো আজও ঘরের ফাঁকা জায়গাটায় মাদুর পেতে পড়তে বসেছে পিয়াল। অন্যদিকে জানালার কাচে চেয়ারে বসে একটা বাংলা দৈনিক পত্রিকা পড়ছিলেন বাবা। পার্থর পায়ের শব্দে মুখ ফিরিয়ে তাকালেন।

- বেরোচ্ছ ?

- হ্যাঁ।

উঠে গিয়ে আলমারি খুলে বাবা একটা খাম বের করে আনলেন।

- ফেরার পথে একবার টালিগঞ্জে যেতে পারবে ? কুঁদঘাটে ?

স্পষ্টভাবে মতামত না জানিয়ে হাত বাড়িয়ে খামটাকে নিল পার্থ।

- ঠিকানাটা ওপরেই লেখা আছে। বিভূতিবাবুর সাথে দেখা করে খামটা তাঁর হাতেই দিয়ে আসবে।

কী একটা ভেবে আবার আলমারি খুলে কুড়িটা টাকা এনে দিতে গেলেন বাবা।

- নাও, রাখো।

পার্থ সঙ্কোচে খানিকটা যেন গুটিয়ে গেল।

- না, না। লাগবে না। আছে আমার কাছে।

তাড়াতাড়ি মায়ের খাটের দিকে সরে গেল সে। মা তাকিয়ে আছেন তার দিকেই।

- একটু আগে আগে ফেরার চেষ্টা করিস, খোকা।

- টিউশন আছে তো আবার ! অর্জুনদের হস্টেলেও যাব। তার উপর আবার...

মা বুঝলেন। গলা খাটো করে বললেন, টাকা-পয়সা সত্যিই কাছে আছে তো ? না থাকলে আমার মাথার এদিকের তোষকের তলায় দ্যাখ দশটা টাকা আছে ; নিয়ে যা।

পার্থ ইশারায় আশ্বস্ত করল মাকে।

- তুমি কিন্তু ঠিকঠাক ওষুধগুলো খেও।

মনোরমা হাসলেন।

- শান্তা কোথায় রে ?

- রান্নাঘরেই তো দেখলাম

- যাবার সময় ওকে একবার ডেকে দিয়ে যা তো। বল আমি ডাকছি।

বাসস্ট্যান্ডে এসে বিপদে পড়ে গেল পার্থ। বাস বন্ধ। অন্যান্য গাড়ি-ঘোড়াও। গতকাল রাতে তেইশ-চব্বিশ বছরের একটা ছেলেকে কারা যেন খুন করে ফেলে রেখে গেছে রাস্তার ধারে। এই এলাকারই ছেলে। রাজনীতি করত। পার্টির লোকজন তাই রাস্তা অবরোধ করেছে আজ। অবরোধ তো না, বন্‌ধ একরকম। ভাঙচুর হবার ভয়ে গাড়ি-ঘোড়া তো বন্ধই, দোকান-পাটও বেশির ভাগ বন্ধ হয়ে গেছে।

এখানে-ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গোটা কয়েক জটলা এখন। বন্ধ দোকানগুলোর সামনে এবং রাস্তার মাঝ বরাবর। অবরোধে আটকে পড়েছে কিছু গাড়ি-ঘোড়া।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল পার্থর। গতকাল রাতে নন্তু বলেছিল বটে - একটা ছেলে খুন হয়েছে। সে কি এই ছেলেটাই ?

নন্তু এর মধ্যেই রাজনীতিতে ঢুকে পড়েছে। ও কি এই ছেলেটার অ্যান্টিপার্টির লোক ?

খবরটা দেবার সময় ওকে কিন্তু খুশি খুশি লাগছিল। তার আশঙ্কাটা যদি সত্যি হয় তাহলে এটা নিশ্চিত যে, মোটেই ভালো পথে নামেনি নন্তু। যে রাজনীতির অস্তিত্ব খুন-খারাপির উপর দাঁড়িয়ে আছে, তাকে কি কোনওভাবেই ভালো বলা চলে ?

আশেপাশের অবস্থা দেখে পার্থ বুঝে গেল আজ আর সহজে গাড়ি-ঘোড়া চলছে না এই রাস্তায়। চললেও কখন চলবে তার ঠিক নেই। কিছুটা হেঁটে গেলে ব্যবস্থা একটা হতে পারে ভেবে সে কারণে অন্য অনেকের মতো হাঁটা শুরু করল পার্থ।

কিছুটা যেতেই একটা জটলা। কী একটা ঝামেলা বেধেছে। পার্থ তাতে আগ্রহী না হয়ে পাশ কাটিয়ে চলেই যাচ্ছিল। এ সময়েই ডাকটা এল।

- পার্থদা, ও পার্থদা। একটা মেয়েলি কন্ঠস্বর। পার্থ মুখ ঘুরিয়ে দেখল - মিলি। জটলার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা রিকশার উপরে বসে হাত তুলে তাকে ডাকছে। পাশে এক চোখে ব্যান্ডেজ বাঁধা এক বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা।

মিলিকে এক সময় পড়াত পার্থ। মিলির তখন ক্লাশ এইট। ভারি অমায়িক ব্যবহার ছিল ওদের সবার। আর বেশ ভদ্র পরিবারও। বাবা মারা যাবার পর কী যে হয়ে গেল ওদের !

মিলিকে নিয়েই কি কোনও গণ্ডগোল ? পার্থ দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল ওদের দিকে। মনে একরাশ উৎকন্ঠা।

কী ব্যাপার মিলি ? তুমি এখানে !

- এই দেখুন না, আই হসপিটালে গেছিলাম দিদাকে নিয়ে। দেখিয়ে ফিরছিলাম। এখানে রিকশাটাকে আটকে দিয়েছে।

আগে সামগ্রিক পরিস্থিতিটা বোঝার চেষ্টা করল পার্থ। এবং বুঝল এটা একপ্রকার খচড়ামি। সুন্দরী একটা মেয়েকে প্রায় একলা পেয়ে তাকে একটু বিরক্ত করা আর কী। পার্থর রাগ হয়ে গেল। ভেবেছে কী এরা, অ্যাঁ ?

- কী হয়েছে বলুন তো ? আপনারা এদের এভাবে আটকে রেখেছেন কেন ?

ছেলেগুলোর ভিতর থেকে অমনি একজন বলে উঠল, লে, কোন হালুয়া আয়া রে ? বন্‌ধে রাস্তায় গাড়িঘোড়া চলা বারণ তা জানে না !

পার্থ মুখ ফিরিয়ে দেখতে পেল না বক্তাটিকে। তবু বলল, আপনারা তো নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছেন একজন অসুস্থ রোগীকে নিয়ে যাচ্ছে। তারপরেও কেন এমন করছেন ? বন্‌ধ ডেকে যা ইচ্ছে খুশি করা যায় ?

এবার সামনে এল একজন। তার মুখে কচি দাড়ির দূর্বাঘাস।

- আপনি বোধহয় বন্‌ধ হোক, সেটা চাইছেন না ?

- সে-বন্‌ধ আপনারা করবেন কি করবেন না আপনাদের ব্যাপার। তা বলে সাধারণ মানুষদের ঝামেলায় ফেলবার অধিকার নিশ্চয় আপনাদের নেই।

- আপনি জানেন কী জন্যে বন্‌ধ ডাকা হয়েছে ?

- আপনাদের একজন খুন হয়ে গেছে, সে কারণেই তো ? তার জন্যে প্রতিবাদ মিছিল বার করতে পারতেন। কিংবা অপরাধীদের ধরবার জন্যে থানায় যেতে পারতেন...।

- তার মানেই তো আপনি চান না এই বন্‌ধ হোক।

- সে আপনারা যেমন খুশি ভেবে নিতে পারেন। তার আগে এদের যেতে দিন। মিলি, রিকশা নিয়ে তোমরা বেরিয়ে যাও -। আমি দেখছি।

ছেলেগুলো কিন্তু এবার আর আটকাল না রিকশাটাকে। বরং তারা প্রায় ঘিরে ধরেছে পার্থকে।

- কোন পার্টি করেন আপনি ? বক্তা আগের সেই চাপদাড়িওয়ালা ছেলেটিই।

পার্থ রেগে গেল।

- তার মানে ! এসব উদ্ভট প্রশ্নেরও উত্তর দিতে হবে নাকি ?

- বা রে, আপনি আমাদের জ্ঞান দেবেন আর আমাদের মনে কোশ্চেন জাগলে তার উত্তর দেবেন না !

- না। এসব ফালতু প্রশ্নের উত্তর আমি দেব না। আমি চললাম। আমার কাজ আছে।

ছেলেটা এবার আলতো করে পার্থর বাঁ হাতটা চেপে ধরল।

- আপনাকে বলে যেতেই হবে।

এবার আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না পার্থ। কী ভেবেছে এরা ! ভেবেছেটা কী ?

- হাত ছাড়ুন। বলে এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিল সে। তারপর বলল, জোর খাটাবেন না। আমি কিন্তু দূরের কেউ নই। এখানেই আমার বাড়ি। বেশি বাড়াবাড়ি করলে কিন্তু ঝামেলা হবে।

পার্থর ওই শেষ কথাতেই কি ভয় পেয়ে গেল ছেলেগুলো ? হয়তো। নইলে তার চলে যাওয়ায় আর বাধা দিল না কেন ?

কিছুদূর হেঁটে যাবার পর রাগে রাগে একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে পার্থ দেখল, ছেলেগুলো সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। তাকিয়ে আছে তার দিকে। ওরা কি ভাবছে সে এই খুনের সঙ্গে জড়িত ? সে ! রাগতে গিয়েও ফিক করে হেসে ফেলল পার্থ। ধুর, এই বয়সের ছেলেগুলো কেন যে এত সন্দেহপরায়ণ হয় !

মাঠে পৌঁছাতে অবশ্য একটু দেরিই হয়ে গেল। ততক্ষণে সবাইই এসে গেছে। শুধু ইলিয়াস আসেনি। তার আসবার কথাও নয়। কয়েকদিন হল অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে। লিগের কয়েকটা খেলা খেলতে পারবে না। ফরওয়ার্ডে খেলে ইলিয়াস। বরাবরই ভালো খেলে। সেন্টার লাইন থেকে ছিটকে এসে পেনাল্টি এরিয়ার মধ্যে পার্থর তুলে দেওয়া বলগুলো সে এত সুন্দরভাবে হেড করে জালে পাঠায় যে, প্রশংসা না করে পারা যায় না। সেই ইলিয়াসের অভাবটা এবার লিগের প্রথম খেলা থেকেই ভালোভাবে অনুভব করবে অভিযান ক্লাব।

মাখনদা খানিকটা দূরে, মাঠের পশ্চিম পাড়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাকে দেখতে পেয়ে হাত তুলে ডাকলেন। সেটা লক্ষ করে তাঁর দিকে এগিয়ে গেল পার্থ।

- কী ব্যাপার ? ক'টা বাজে ?

- সরি মাখনদা, দেরি হয়ে গেল একটু।

-ব্যস, বলে খালাস !

- বিশ্বাস করুন, আমি ঠিক সময়েই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম। কিন্তু পথে এমন একটা ঝামেলায় ফেঁসে গেলাম যে...

থাক। কোনও অজুহাত শুনতে চাইনে। আচ্ছা, আমি কি সবাইকে বলিনি আমার কাছে কোচিং নিতে হলে ঠিক টাইমে মাঠে আসতে হবে ? বল, বলিনি ?

পার্থ কিছু একটা বলবার চেষ্টা করল। কিন্তু মাখনদা তাকে থামিয়ে দিলেন।

- দ্যাখ পার্থ, আমি সব সইব - সব ; কিন্তু প্রাকটিসে ফাঁকিবাজি আর নিজেদের খেয়াল-খুশি মতো মাঠে আসা - এ আমি কিছুতেই বরদাস্ত করব না।

- আগে আমার কথাটা শুনুন...

- তোর কোনও কথা আমি শুনতে চাইনে আজ। তুই হতে পারিস এই অভিযান ক্লাবের সেরা খেলোয়াড়দের একজন। কিন্তু মনে রাখিস আমি এখনও এই ক্লাবের কোচিং-এর দায়িত্বে আছি। আমি চলে গেলে যা খুশি করিস, দেখতে আসব না। এখন যা। যতক্ষণ না থামতে বলব, ততক্ষণ মাঠটাকে রাউন্ড করে দৌড়া গিয়ে, যা।

পার্থ আর কথা বলতে পারল না। রুদ্ধ অভিমানে যেন গলা বুজে এল তার। মাখনদার নির্দেশ মতো মাঠের চারদিকে দৌড়ানো শুরু করে দিল সে।

সত্যেন বল নিয়ে নানানভাবে তার স্কিল দেখাচ্ছে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে সুখেন পার্থকে একপাক ঘুরে আসতে দেখে এগিয়ে এল সে। পাশাপাশি দৌড়াতে দৌড়াতে বলল, শালা হাড়গিবলেটা আজ হেবি রেগে আছে। আমাকেও কথা শুনিয়েছে। দেবো কোন্‌দিন মায়ের ভোগে পাঠিয়ে !

মাখনদার উপরে সুখেনের যে কিছুটা রাগ আছে, জানে পার্থ। বেশির ভাগ দিন সুখেনকে পুরো ম্যাচ কখনও খেলান না মাখনদা। কেন কে জানে ! অথচ ডিফেন্সে খুব একটা যে খারাপ খেলে - তা নয়। তবু পুরোটা সময় খেলতে পায় না সুখেন। তাই রাগ।

খানিকটা বিনা অপরাধে শাস্তি পেয়ে মাখনদার প্রতি একটা তিক্ততার ভাব এসেছিল তার মনেও। তবুও সুখেনের কথাগুলো শুনতে ভালো লাগছিল না পার্থর। মাখনদাকে 'শালা' বলছে, গালি দিচ্ছে সুখেন। বিরক্ত হয়ে তাই সে গতি বাড়িয়ে দিল আরও। হঠাৎ-ই।

সুখেন অপ্রস্তুত। অতএব থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে।

পার্থ ঠিক কতক্ষণ ওভাবে দৌড়েছিল, খেয়াল নেই। বন্ধ ছিল দু'চোখের পাতা। সেই বন্ধ চোখের আগল ঠেলে জলের একটা সরু ধারা নেমে এসে আপনা থেকেই শুকিয়ে গেছিল। তারপর কখন যে মাখনদা তাকে ডেকেছেন খেয়াল করেনি পার্থ। দৌড়ও থামায়নি। একটা তীব্র অভিমান তাকে শক্তি জোগাচ্ছিল। খুব জোরে অবশ্য দৌড়াচ্ছিল না। অভিযানের গোল কিপার দেবাশিষ এসে হাত টেনে ধরতেই থেমে গেল

সে। মাঠে কেউ নেই এখন। ক্লাবঘরের বারান্দায় দু-চারজন দাঁড়িয়ে আছে। ওদের সামনে বল হাতে মাখনদা।

মাখনদাকে দেখেই অভিমানটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল পার্থর। ছল ছল করে উঠল চোখ। ধরা পড়ে যাবার ভয় তাকে তাড়িয়ে নিয়ে এল মাঠ থেকে।

রাস্তায় বেরিয়েই দেখল রেস্টুরেন্টের সামনে দাঁড়িয়ে মাখনদা। চোখাচোখি হতেই মুখ নামিয়ে নিল সে।

মাখনদা এসে হাত ধরলেন, আয়।

পার্থ নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল। থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে চাইল। পারল না। মাখনদা তাকে টেনে নিয়ে গিয়ে রেস্টুরেন্টের একটা কেবিনে বসিয়ে দিলেন। বললেন, এখানে বোস চুপটি করে। একদম নড়বি না। - কী রে, খুব যে রেগে আছিস দেখছি ! অ্যাই অ্যাই, মুখ তোল। তোল বলছি ! জোর করে মুখটা তুলে ধরতে গিয়ে অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন মাখনদা, একি, তুই কাঁদছিস !

সত্যিই কাঁদছিল পার্থ। একটা রুদ্ধ অভিমান কান্না হয়ে ঝরে পড়ছিল তার দু'চোখ বেয়ে।

- হা রে পাগল ! আরে বাবা, শাস্তি দিয়েছি আমিই তো, নাকি ? ছোট ভাইকে দাদা শাস্তি দিতে পারে না ? বোকা কোথাকার ! তাকা আমার দিকে। তাকা। তুই কি চাস যে তোর মাখনদার পার্সোনালিটি ধুলোয় মিশে যাক ? যে আইন আমার নিজের হাতে গড়া, তা বিশেষ কারও জন্যে ভেঙে ফেলি ? বল, তাই চাস তুই ?

- আমার জন্যে কাউকে আইন ভাঙতে বলিনি আমি।

- বলিসনি তো ? বেশ, বেশ। তাহলে এবার বল দেখি দেরি হল কেন ? রাস্তায় জ্যাম ছিল ?

মনের ভিতরে জমে থাকা অভিমানের ভারটা ক্রমশ নেমে যাচ্ছে। হালকা হয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে, বুঝতে পারছিল পার্থ।

মাখনদাও নাছোড়বান্দা, কী হল, বলবি তো ?

পার্থ তবু খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, মানিকতলায় গতকাল রাতে একজন খুন হয়ে গেছে।

- খুন !

- হ্যাঁ।

- চেনা কেউ ?

- না।

- তবে ?

- পার্টির কেউ হবে হয়তো।

- তাই রাস্তা অবরোধ করেছে। গাড়ি-ঘোড়া চলেনি - এই তো ? দুর, দুর। এই বন্‌ধ-অবরোধ করে করেই দেশটা গেল একেবারে ! ওতে কী লাভ হয় কে জানে ! কেবল সাধারণ মানুষদেরই ভোগান্তি দেওয়া। পার্টি তো আমরাও একসময় করেছি। বন্‌ধ-অবরোধ তখনও হয়েছে। বিশেষ একটা লাভ হয়নি কোনওদিন। এখনও হয় না।

এই মাখনদা একসময় পার্টি করতেন ? কই, এর আগে শোনেনি তো সে ! পার্থ বিস্মিত হয়ে তাকাতেই মাখনদা বললেন, অমন করে তাকাচ্ছিস যে ? একসময় পার্টি করতাম বিশ্বাস হচ্ছে না ? খাদ্য আন্দোলনের সময়ে আমি জেল খেটেছিলাম তা জানিস ? আরও শোন, সবাই ভাবে মাখন চক্কোত্তি ফুটবল তাড়া করেই জীবনটা

কাটিয়ে দিল। কিন্তু এই মাখনই যে একসময় রাস্তায় পেটো ঝেড়েছে, ট্রাম-বাস পুড়িয়েছে সে খবর ক'জন রাখে ?

এবারও পার্থ বিশ্বাস করতে পারল না পুরো ব্যাপারটা। সেটা বুঝতে পারলেন মাখনদা, নিশ্চয় ভাবছিস গাল-গপ্প দিচ্ছি। কিন্তু না, গাল-গপ্প না। তখন আমার বয়স অল্প। শরীরে গরম রক্ত। খাদ্য আন্দোলনে যখন পশ্চিমবঙ্গ উত্তাল, তখন আমাদের মতো ছেলেরা -। কলেজ লাইফে ছাত্র-রাজনীতি করতাম তো ! তারই রেশ বলতে পারিস। তা - সরকারকে একটু কড়কে দিতে গেলে পেটো-টেটো ঝাড়লে ভালো হয়, ট্রাম-বাস পোড়ালে সকলের দৃষ্টিও আকর্ষণ করা যায়, সেটা বুঝে আমরাও...। হীরো বনে গেছিলাম জানিস ? শেষে পুলিশের প্যাদানি খেয়েই রাজনীতির ভূতটা ঘাড় থেকে নেমে গেছে। লেগে থাকলে আমিও হয়ত আজ এম. এল. এ.-এম. পি. বনে যেতে পারতাম।

আরও কিছু বলতেন কিনা কে জানে। ওয়েটর টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াতেই থেমে গেলেন মাখনদা।

- দু'কাপ চা আর দু'প্লেট পকোড়া।

- দু'টো দু'টো কী হবে ? আমি কিন্তু কিছু খাব না।

- কেন ? খাবি না কেন ?

- ওসব ভাজাভুজি খেতে ইচ্ছে করছে না।

- খিদে পায়নি ? আমার কিন্তু পেয়েছে।

- আপনি খান না। আমি ততক্ষণ বসছি।

- আমি খাব আর তুই চুপচাপ বসে থাকবি - তা হয় ? কিছু না খাস এক কাপ চা খা অন্তত।

- শুধু চা কিন্তু।

- ও. কে বাবা ও.কে। এই ওয়েটর, পকোড়া এক প্লেট দিলেই হবে। চা দু'কাপ।

শোনার ভুলেই হোক আর যে কারণেই হোক, ওয়েটর দু'কাপ চা এবং পকোড়া দু'প্লেটই দিয়ে গেল।

পার্থ ওয়েটরকে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, মাখনদা হাত তুলে বারণ করলেন, আরে, ছাড় না বাবা। এক প্লেট পকোড়া খেলে মহাভারত কিছু অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।

চুপ করে গেল পার্থ। কিন্তু বুকের মধ্যে খচ খচ করতে লাগল। তার জন্যে বাড়তি কিছু টাকা খরচ হয়ে গেল মাখনদার ! একবার এ-ও ভাবল এক প্লেট পকোড়ার দাম সে নিজেই মিটিয়ে দেবে। কিন্তু নিজের পকেটের অবস্থার কথা ভেবে দমে গেল সে। তাছাড়া সেটা খারাপ দেখায়। মাখনদা রেগেও যেতে পারেন। তার চেয়ে বরং হাতে তেমন টাকা এলে একদিন খাইয়ে দিলেই হবে।

এর পরে বিশেষ আর কথা হল না, দু'একটা খেলাধুলার কথাবার্তা ছাড়া।

বিল মিটিয়ে রাস্তায় এসে মাখনদা জিজ্ঞেস করলেন, তারপর ? এখান থেকে কোথায় ? বাড়ি ফিরবি না নিশ্চয়।

- না। একটু বেরোব। কুঁদঘাটে যাব একবার।

- কুঁদঘাট ! হঠাৎ কুঁদঘাটে ?

- একজনের সঙ্গে দেখা করতে যাব।

- যেখানেই যাও বাবা, বিকেলে প্র্যাকটিসে যেন পাই। সকালে তো কিছুই হল না। - আসছিস তো বিকেলে না কি ?

অদ্ভুত হলেও সত্যি যে, মাখনদা কয়েকদিন ধরে তাঁর ফুটবলারদের দু'বেলা প্র্যাকটিস করাচ্ছেন। গতবার লিগের খেলায় প্রথম দিকে ভালো খেলেছিল অভিযান। কিন্তু শেষের দিকে সুবিধা করতে পারেনি। এবার তাই এত চেষ্টা, এত কঠোরতা। ছোট দলগুলোকে তো একটু বেশি খাটাখাটনি করতেই হবে। - পার্থ তা জানে। তাই সে বলল, আসব তো অবশ্যই।

ইলিয়াসটা ঠিক এ সময়েই অসুখটা বাধাল। ওর জায়গায় কাকে খেলাই এখন !

- কেন, প্রদীপ তো আছে !

- প্রদীপ ? ধু-- র--। ওর দ্বারা কিস্যু হবে না। কোথায় ইলিয়াস আর কোথায় প্রদীপ !

- তা হলে সুদীপ্ত ?

- আরে বাবা, প্রথম খেলাটা পড়তে পারে উয়াড়ীর বিরুদ্ধে। যাকে-তাকে খেলিয়ে রিস্ক নেওয়া যায় ?

- ইলিয়াসের অবস্থাটা কী বুঝছেন ? ও কি প্রথম ম্যাচের আগে কোনও মতেই সেরে উঠবে না ?

- সে আশা কম। ভালো ডাক্তারই তো দেখাতে পারছে না। আমি গিয়ে গোটা পঞ্চাশেক টাকা দিয়ে এসেছি ওষুধপত্র কেনার জন্যে। কিন্তু পঞ্চাশ টাকায় আজকাল কী হয় বল তো ? শুকনো মুখে বললেন মাখনদা। তাঁকে খুব চিন্তিতও দেখাচ্ছিল।

হাঁটতে হাঁটতে বাস স্ট্যান্ডে চলে এসেছিল পার্থরা। একটা বাস তখনই ছাড়ছিল। মাখনদা উঠে পড়লেন সেটায়।

চলি রে। বিকেলে আবার দেখা হবে।

প্রত্যুত্তরে হাতের ইশারায় পার্থ আশ্বস্ত করল তাঁকে।

কুঁদঘাটে গিয়ে বাড়িটা খুঁজে বার করতে তেমন একটা বেগ পেতে হল না। রাস্তার ধারেই বাড়ি। তিনতলা। নিচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। ভিতরে চেনা-অচেনা বাহারি ফুলের ছোট্ট একটা বাগান। সব মিলিয়ে বেশ ছিমছাম বাড়িটা, যা এ বাড়ির মালিকের রুচির পরিচয় বহন করছে। নিজেদের ভাড়াবাড়ির সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে হেসে ফেলল পার্থ। অভাব থাকলে স্বভাব যা হয় আর কী। ভালো কিছুর সঙ্গে নিজেদের খারাপ দিকটার তুলনা আগে মাথায় আসে। এটা আসলে নিজেকে দীন ভেবে কুঁকড়ে জাওয়া।

গেট পেরিয়ে লনে পা রাখতেই দোতলায় কি তেতলায় কুকুরের ডাক শুরু হয়ে গেল। আর ঠিক তখনই পার্থর মনে পড়ল, গেটে সে দেখেছিল বটে 'সাবধান ঃ কুকুর আছে' - এমন একটা কিছু লেখা। অন্যমনস্কতার কারণে ভালো করে পড়ে দেখা হয়ে ওঠেনি।

কুকুরটা কি শিকলে বাঁধা আছে ? নাকি ছেড়ে রাখা ? ভয়ে ভয়ে কলিংবেলটা টিপতেই ওপাশে ঝরনার শব্দ শুনতে পেল সে।

- কে -- ?

কোনও বয়স্কা মহিলার গলা। পার্থ সেই জিজ্ঞাসার উত্তর দেবে কি দেবে না ভাবতে

ভাবতেই আবার সেই একই কন্ঠস্বর --

- রিমি, দেখ তো কে এল।

- টমি, ট - মি--। এবার অন্য গলা।

কুকুরের ডাকটা ক্রমশ জোরাল হচ্ছে। তার মানে সঙ্গে কুকুর নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসছে রিমি নামের কেউ একজন।

ব্যাপারটা এতক্ষণে হৃদয়ঙ্গম হল পার্থর। আজকাল ডাকাতিটা খুব বেড়ে গেছে। তাই এমন সুরক্ষিত ব্যবস্থা, কিছুটা সামাল দেবার চেষ্টা।

বিশ্রীভাবে ডাকছে কুকুরটা। দরজা খোলার আগের মুহূর্তে তাই সে চাপা ধমক খেল। আহ্, টমি !

তারপরই খুলে গেল দরজা।

- কাকে চাই ?

- এটা বিভূতি চ্যাটার্জির বাড়ি তো ?

- হ্যাঁ।

- বিভূতিবাবু আছেন ?

- না। বাবা তো অফিসে।

- ও।

- কিছু বলার থাকলে আমাকে বলতে পারেন।

- না, মানে, একটা চিঠি দেবার ছিল।

চিঠিটা বার করে মেয়েটির হাতে সেটা ধরিয়ে দিল পার্থ। মেয়েটি তার মুখের দিকে তাকিয়ে কী ভাবল কে জানে ; বলল, মা আছে। আপনি মা-র হাতে দিয়ে যান। - বলে চিঠিটা ফিরিয়ে দিল আবার।

মেয়েটির পিছন পিছন ওদের বসার ঘরে চলে এল পার্থ। বেশ সাজানো-গোছানো ঘরটা। দামি সোফা সেট আর দামি দামি আসবাবে যেন ছবির মতো সুন্দর লাগছে।

তাকে বসিয়ে রেখে মেয়েটি চলে গেল মাকে ডাকতে। আর এদের বৈভব দেখে গুটিয়ে থাকা পার্থ চুপচাপ বসে রইল একা। বাড়ি থেকে বেরিয়ে এক ফাঁকে চিঠিটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েছে সে। ভদ্রলোক নাকি কবে বলেছিলেন তার জন্যে একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দেবেন। এ চিঠিতে তার বাবা ভদ্রলোকের সেই প্রতিশ্রুতিকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

ভদ্রমহিলা আসছিলেন। অচিরেই বিপুলদেহিনী সেই তাঁকে দেখা গেল সিঁড়িতে। পিছনে আগের সেই মেয়েটি।

পার্থ মেলাতে পারছিল না দু'জনকে। ওই মেয়ের এই মা !

ভদ্রমহিলা এসে থপ করে সোফার উপরে বসে পড়ে বললেন, কই, দেখি কী চিঠি এনেছেন।

পার্থ বিরক্ত হল। চিঠিটা কি উনি এখনই পড়বেন নাকি ? তবু সে এগিয়ে দিল চিঠিটা।

চিঠিটাকে খুলতে খুলতে ভদ্রমহিলা জানতে চাইলেন, কোত্থেকে আসছেন আপনি ?

- মানিকতলা। বলল পার্থ। তখনও তার মুখে বিরক্তি।

উত্তরটা উনি শুনলেন কি শুনলেন না বোঝা গেল না। ততক্ষণে খুলে ফেলেছেন চিঠিটাকে। এবং পড়তে পড়তে চোখ-মুখ উজ্জ্বল।

- তুমি সুমিতদার ছেলে ? কী আশ্চর্য, আগে বলবে তো ! আমি ভেবেছি কে না কে --। রিমি, এ হল তোর সেই সুমিত জেঠুর ছেলে। সুমিত জেঠুকে মনে নেই তোর ? সেই যে শিবপুরে --। পাশের বাড়িতে থাকত।

মনে না করতে পেরে মিষ্টি করে হাসল রিমি।

পার্থর কিন্তু মনে পড়ে গেল। সেই কবে, কতকাল আগে, সবটা বোঝার বয়স তখন তার হয়নি ; তারা থাকত শিবপুরে। বাবা-কাকাদের পৈতৃক বাড়িতে। যৌথ পরিবারে। সে সময় পাশের বাড়ির একটা ছোট্ট মেয়ে প্রায় সারাটা দিন তাদের বাড়িতেই থাকত, খেত, খেলা করত। বাবা আর মা তাকে মেয়ের মতো ভালবাসতেন। কিন্তু সে নিজে মেয়েটিকে দু'চোখে দেখতে পারত না। হিংসাও করত। সময়-সুযোগ পেলে কতদিন যে সে তাকে চিমটি কেটে কেটে পালিয়েছে ! এ কি সেই মেয়েটি ? নামটা কী ছিল আজ আর মনে নেই। রিমিই কি ? কে জানে !

- অনেকদিন আগের কথা তো। তোমাদের কারও মনে না-ও থাকতে পারে। তোমরা তখন ছোট। রিমি তো আরও ছোট-। কী মিষ্টি ছেলে ছিলে তুমি ! কাকিমা বলতে পাগল। কিন্তু বেশ দুষ্টু ছিলে। কী যেন নাম তোমার, আহ্ মনে আসছে না।

- পার্থ।

- পার্থ ! হ্যাঁ, হ্যাঁ। মনে পড়েছে। পার্থই তো !

পার্থ নিচু হয়ে পা ছুঁয়ে প্রণাম করল কাকিমাকে।

- থাক, থাক, বাবা। আশীর্বাদ করি বড় হও।

রিমি সেই আগের মতোই মায়ের পিছন দিকে দাঁড়িয়ে আছে। চোখাচোখি হতেই হাসি

মুখে বলল, আপনার খেলা আমি দেখেছি।

- খেলা ! পার্থ খেলোয়াড় নাকি ? কাকিমার চোখে-মুখে সত্যিকারের বিস্ময়।

- হ্যাঁ মা। উনি খুব ভালো ফুটবল খেলেন।

- ও মা, তাই ?

পার্থ খানিকটা লজ্জা পেয়ে বলল, না, না। খুব ভালো আর কোথায় !

- রিমি যখন বলছে, তখন নিশ্চয় ভালো খেলো। ও নিজেও তো একজন ফুটবলার।

একটু যেন অবাক হল পার্থ। বিস্ময় ভরা চোখে রিমির দিকে তাকাল সে।

- আপনিও ফুটবল খেলেন ?

- একটু-আধটু। তবে আপনার মতো ভালো খেলতে পারি না।

- অ্যাই, অ্যাই, 'আপনি' কীসের রে ? ছোটবেলার বন্ধুরা নিজেদের মধ্যে কেউ 'আপনি' 'আপনি' বলে ? - মাঝখানে বলে উঠলেন কাকিমা। তাতে হেসে ফেলল পার্থ। হাসল রিমিও।

কাকিমা আবার বললেন, রিমি এবার ইন্ডিয়া-টিমে চান্স পেয়েছে জানো পার্থ ?

ইন্ডিয়া-টিমে ! পার্থর মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে কিছুটা যেন কুন্ঠিত হয়ে উঠল রিমি।

- তা হলে তো আমার চেয়েও ভালো খেলে।

মোটেই না। ইন্ডিয়া-টিমে খেললেই বুঝি ভালো খেলোয়াড় হয়ে যাওয়া ? তাছাড়া ছেলেদের খেলা আর মেয়েদের খেলা এক নাকি ?

এরপর বিশ্বকাপ ফুটবলের কথা উঠল। ছেলেদের ফুটবল, মেয়েদের ফুটবল। কী হবার ছিল, কী হল ; ভারত কেন ফুটবলে আজও পিছিয়ে, আর কবে বিশ্বকাপে খেলবে ভারত -- এসব আর কী।

তারপরে উঠল পারিবারিক প্রসঙ্গ। - পার্থর বাবা-মা কেমন আছেন, কাকারা এখন কে, কোথায় - এবং আরও অনেক কথা। পার্থরা শিবপুর ছাড়ার পরেও কয়েক বছর তাঁরা ওখানে ছিলেন। শেষে এখানে বাড়ি করে চলে এসেছেন - কথায় কথায় জানালেন কাকিমা। সেই সঙ্গে পুরনো দিনের টুকরো টুকরো স্মৃতি। কিন্তু স্মৃতি কি সহজে ফুরাবার ? অথচ পার্থকে আরও কতকগুলো কাজ সারতে হবে। তাই একসময় উঠে পড়তেই হল তাকে।

ইলিয়াসদের বাড়িতে যখন গিয়ে পৌঁছল, তখন বেলা দুপুর ছুঁই ছুঁই। বস্তি এলাকা। টালির ছাউনি আর মুলিবাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা সব ঘর। আশে-পাশে গোটা কতক একতলা-দোতলা বাড়ি। কিন্তু সেখানে অন্য জগৎ, অন্য সভ্যতা। একেবারে পাশাপাশি থেকেও এই স্বাতন্ত্র্য বোধ হয় নাগরিক সভ্যতাতেই শুধু সম্ভব। অথচ বস্তিতেও কিছু কিছু ভদ্রলোকের বসবাস। যেমন ইলিয়াসরা। ওদেরকে এই বস্তির পরিবেশে মানায় না বটে ; কিন্তু তাদের মতো গরিব মানুষের বসবাসের জন্যে কম ভাড়ায় এর চেয়ে ভালো বাসস্থান আর কোথায় মিলবে ?

এর আগেও কয়েকবার সে এসেছে এখানে। কখনও ইলিয়াসের সঙ্গে, কখনও একা একা।

আজ ওকে দেখেই ইলিয়াসের মা বারান্দার এক কোনায় তৈরি ছোট্ট রান্নাঘরটা থেকে বেরিয়ে এলেন।

- এসো বাবা, এসো।

- কেমন আছে ও এখন ?

- জ্বর অবশ্য একটু কমেছে। এখন আল্লা কী করে দেখি।

- ব্লাড টেস্ট করানো হয়নি তো ?

- পয়সা কোথায় বাবা ?

- হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারতেন।

- ওখানেও তো এখন পয়সা লাগে।

- এলাকার কাউন্সিলারের কাছ থেকে লিখে-টিখে নিয়ে গেলে বোধহয় ফ্রি-তেও হয়। আপনি খোঁজ নিয়ে দেখবেন। নিশ্চয় হয়। কার কাছে যেন শুনেছিলাম।

ইলিয়াসের মা এই ব্যাপারটা সম্পর্কে তেমন খোঁজ-খবর রাখেন না বলেই মনে হল পার্থর। তা ছাড়া অসহায়তাও রয়েছে খানিকটা।

পার্থর কাছে তাই যেন ভেঙে পড়লেন ইলিয়াসের মা। একা একা আমি কোন্‌দিকে কী করি বলো তো ! ওদিকে কাজে না গেলে পেট চলবে না, এদিকে আবার এই অবস্থা। ক'দিন তো তাও ঘরে বসেই আছি। মালিক খবরের পরে খবর পাঠাচ্ছে। - কোন দিক সামলাব ?

ইলিয়াসদের সমস্যাটা পার্থর অজানা নয়। বাবা নেই ইলিয়াসের। বছর পাঁচেক আগে

মারা গেছেন তিনি। সংসারে এখন শুধু সে আর মা। তাতে সংসার ছোট বটে ; কিন্তু সচ্ছল মোটেই নয়। গুলের একটা কারখানায় কাজ করেন ইলিয়াসের মা। সামান্য যা পান, তাতে দু'জনের চলে যায় মোটামুটিভাবে। ওর মধ্যেই ছেলেকে ঘিরে তাঁর স্বপ্ন দেখা এবং যাবতীয় হাসিখুশির রাজ্যপাঠ। ইলিয়াস নিজেও অবশ্য রাতের বেলায় বই বাঁধাইয়ের কাজ করে। কিন্তু তা অনিয়মিত। বইমেলার আগে আগে আর শিক্ষাবর্ষ শুরুর দিকে কখনও-সখনও কাজ মেলে। বাকি দিনগুলোতে সে প্রায় বেকার। অতএব দু'জনের মিলিত আয়েও সংসারের টানাটানি মেটে না কখনও। ওর মধ্যে বাড়তি ঝামেলা দেখা দিলে চিত্তির। তখন ধার-দেনা করা ছাড়া উপায় থাকে না। তা-ই বা আবার সব সময় মেলে কোথায় ? এ বস্তিতে সকলের অবস্থাই যে ওদের মতন ! কারও কারও অবস্থা তো বরং আরও খারাপ। ওরকম পরিবেশ-পরিস্থিতির মধ্যেও ইলিয়াস যে কীভাবে উচ্চমাধ্যমিকটা পাশ করেছে, তা ভেবে উঠতে পারে না পার্থ।

ইলিয়াসের মা বলতে লাগলেন, চিন্তায় চিন্তায় আমার মাথা খারাপ হবার জো হয়েছে বাবা। সংসারে আরেক জনও যদি কেউ থাকত !

পার্থ তাড়াতাড়ি বলল, না, না। বেশি চিন্তা-টিন্তায় যাবেন না। টেনশন থেকে কখন কী হয়ে যাবে...। আর চিন্তারই বা কী আছে ? আমরা তো আছি !

- সে তো আছই। তোমরা আছ বলেই তো... যাও না। যাও। ভেতরে গিয়ে বসো।

কোথায় ও ?

- ওই তো, ঘরে। ঘুমোচ্ছে বোধহয়। - বললেন ইলিয়াসের মা। তারপর অপেক্ষা না করেই গলা বাড়িয়ে ডাকলেন, খোকা, ও খোকা। দ্যাখ কে এয়েছে।

পার্থ খানিকটা নিচু হয়ে, নুয়ে পড়া টালির চাল থেকে মাথা বাঁচিয়ে ঘরের ভিতরে চলে এল।

ঘুম ভেঙেছে ইলিয়াসের। গায়ের উপরের কাঁথাখানা সরিয়ে দিয়ে তাকিয়ে আছে দরজার দিকে। দেখতে পেয়ে ডাকল, আয়।

পার্থ এসে ওর বিছানার এক কোনায় বসতে গেল ; কিন্তু হা হা করে উঠল ইলিয়াস, আরে, আরে। এখানে না। ওই চেয়ারটা টেনে নিয়ে বস।

- কেন ? হঠাৎ অচ্ছুত হয়ে পড়লাম নাকি ?

- আরে ধেৎ, তা না। আমার হাওয়া লেগে তোর যদি জ্বর বাঁধে, তাহলে আর দেখতে হবে না। অভিযানের লিগ খেলা তখন মাথায় উঠবে যে !

মৃদু হাসল পার্থ।

-তোর জ্বর ছোঁয়াচে কোনও রোগ তো না। জ্বর যদি বাঁধেই এমনিতেই বাঁধবে। অতএব আগে থেকে ভয় পাওয়ার বান্দা আমি নই। আর লিগের খেলা ? তুই না থাকাতে সে তো এমনিতেই মাথায় উঠেছে। বাড়তি কী আর এমন হবে ? আমি থাকাও যা, না থাকাও তা।

মোটেই না। অভিযান ক্লাবের তুইই তো সব। তোকে ছাড়া ক্লাব ভেসে যাবে।

- আর তুই ? তোর জন্যে বুঝি ক্লাবের কোনও ক্ষতি হবে না ?

- আমার জন্যে ! আমার জন্যে কী আবার হবে ? সুদীপ্ত আছে। প্রদীপ আছে... আমার জায়গায় কেউ একজন নেমে পড়লেই হল।

- বাজে বকিস না তো ! কী করে তাড়াতাড়ি সেরে উঠতে পারিস, সেটা দ্যাখ।

- সেরেই তো গেছি। - বিশ্বাস হচ্ছে না ? এই দ্যাখ, গা দিয়ে কেমন ঘাম ছুটেছে। - ইয়ার্কির সুরে বলল ইলিয়াস।

পার্থ বিছানারই এক পাশে বসে ডান হাতের উল্টো পিঠ ছোঁয়াল ইলিয়াসের কপালে।

তাই তো রে। বেশ ঘেমে গেছিস তো !

- তবে ? ইলিয়াসের গলায় সেই একই সুর। কিন্তু একটু সময় বাদেই স্বাভাবিকভাবে সে বলল, আসলে এরকমটাই হচ্ছে। এক একবার ঘাম এসে জ্বর ছেড়ে যাচ্ছে, আবার কাঁপুনি দিয়ে ফিরে আসছে।

- ওষুধ খাসনি ?

- হ্যাঁ। ঘোড়ামারা ডাক্তারের কাছ থেকে মা ওষুধ এনে দিয়েছে।

- কোন্ ডাক্তার !

- ঘোড়ামারা ডাক্তার।

- ও বাবা ! সে আবার কে ?

- আছে রে আছে। সবাই কি আর মানুষ মারে ? ঘোড়াও তো মারে কেউ কেউ। সেরকমই একজন এই পাড়াতেই থাকে। আগে নাকি রেসের ঘোড়ার চিকিৎসা করত। সেখানে অনেকগুলো ঘোড়াকে ভুল ওষুধ দিয়ে মেরে ফেলে, ঠ্যাঙানি খেয়ে এ-পাড়ায় এসে জুটেছে। এখন মানুষের ডাক্তারি করছে।

- যাহ্ !

- হ্যাঁ রে। সত্যি। লোকে বলাবলি করে।

তুই কিনা তাকেই দেখাচ্ছিস !

- উপায় কী ? ফি নেয় না যে ! শুধু ওষুধের দামটা নেয়। ওষুধের দামটা অবশ্য একটু বেশি বেশিই ধরে, তো কী করা যাবে ! ছাড় ওসব কথা। ওদিকের খবর কী বল ? সব

ঠিকঠাক আছে তো ?

- ওদিকের মানে ? কোন দিকের ?

- তোর হবু বউয়ের।

- কোয়েল ? ধুর ! ক'দিন দেখাই হচ্ছে না।

- কেন ?

- কেন আবার। পরীক্ষা ! পার্থর চোখেমুখে একরাশ বিরক্তি এবং যেন বা একটু কষ্টও। তা দেখে মৃদু হাসল ইলিয়াস।

- বুঝি নে বাপু তোদের ধরন-ধারণ ! আমি হলে তো সোজা বাড়িতে গিয়ে ঠেলে উঠতাম। না ভাই, প্রেমিকার সাথে তিন-চার দিন দেখা হবে না, তা-ও একই এলাকায় থেকে, এ আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারতাম না।

- তুই বুঝতে পারছিস না ব্যাপারটা। ওদের বাড়িতে মাঝে মাঝে যাই তো ! এবারের কেসটা সম্পূর্ণ অন্য রকম। কোয়েলকে তো চিনিস না, যা-ই করুক তাই করুক, আমাদের মতো না। পড়াশুনায় খুব সিরিয়াস। ও-ই নিজে থেকে যেতে বারণ করে দিয়েছে। বলে দিয়েছে টেস্টের পরে ছাড়া আর দেখা হবে না।

- তোর তো তাহলে খুব কষ্টে দিন কাটছে রে !

- ওই আর কী। খেলাধুলোর সঙ্গে যুক্ত ছিলাম বলে বাঁচোয়া। এভাবে থাকি ক'দিন। খুব মন খারাপ লাগলে থোড়া-ই কেয়ার। সরাসরি না হোক, লুকিয়ে চুরিয়ে হলেও ঠিকই দেখে আসব। - বলে হেসে ফেলল পার্থ। হাসল ইলিয়াসও।

- মাঠের খবর-টবর কী ? প্র্যাকটিস-ট্র্যাকটিস ঠিকঠাক চলছে নিশ্চয়।

- চলবে না আবার ! বাপরে বাপ, মাখনদা যা কড়া ! প্র্যাকটিস বন্ধ হবার উপায় আছে ? আজ পৌঁছাতে একটু দেরি হয়েছে। তাই যা ঝাড় খেলাম ! ওখান থেকে টালিগঞ্জে গিয়ে কাজ সেরে তারপর এই তোর এখানে।

- টালিগঞ্জে আবার কী কাজ ছিল তোর ?

- বাবার একটা চিঠি পৌঁছে দিতে গেছিলাম। বাবারই এক বন্ধুর বাড়ি। ওপরমহলে ভদ্রলোকের বোধহয় বেশ হাত আছে।

- চাকরির ব্যাপার মনে হচ্ছে !

- সেরকমই ধরে নে।

- দেখা হয়েছে ভদ্রলোকের সাথে ?

- নাহ্। তবে চিঠিটা দিয়ে এসেছি বাড়িতে।

-কী ভাব বুঝছিস ? হবে ?

- তা আগের থেকে কী করে বলব !

- হবে না, হবে না। চাকরি-বাকরি তোর-আমার কারোরই হবে না। আসলে কপাল লাগে। কপাল। নসিবই সব রে পার্থ ! নসিবে না থাকলে কিচ্ছু হয় না। না হলে ভাব, ভেবে দ্যাখ - এই যে তুই, আমি, আমরা সবাই মন-প্রাণ দিয়ে ভালো খেলার চেষ্টা করি, তবু কই, কিছুই তো পেলাম না এখনও ! - খানিকটা ক্ষোভের সঙ্গেই বলল ইলিয়াস।

প্রত্যুত্তরে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ল পার্থ। তারপর খানিকটা ধীর গলায় বলল, তা যা বলেছিস !

রাত আটটার দিকে শিয়ালদায় বাস থেকে নেমে খানিকটা রাস্তা অটোতে। তারপর হেঁটে মানিকতলা বাজারের কাছে আসতে আসতে একটা বিপরীত চিত্র দেখল পার্থ। একেবারেই যেন ঝিমিয়ে পড়েছে বাজারটা। লোকজন কোথাও নেই। দোকান পাঠও সব বন্ধ। রাস্তার উপরে ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে ভাঙা বোতলের টুকরোটাকরা। সোডার বোতল সব। কলেজে পড়ার সময় সি.পি. আর এস.এফ.আই.-এর ভিতরে গণ্ডগোলের সময়ে এসবের বহুল ব্যবহার সে দেখেছে কয়েকবার। কিন্তু এই সোডার বোতলই বা ছুড়ল কারা ? বাতাসে বারুদের গন্ধও বা ছড়াল কারা ? সকালের সেই খুনের ব্যাপারটারই রেশ কি এসব ? তা-ই সম্ভবত।

পার্থর ভয় ভয় করতে লাগল। আজকের এ রাতে পথচারী মাত্রই যেন অ্যান্টিপার্টির লোক। আর অ্যান্টিপর্টি মানেই তো...। সে তাই সতর্ক হয়ে গেল। আশেপাশের অন্ধকার গলির ভিতরে কেউ লুকিয়ে থাকতেই পারে। হয়তো এক জোড়া অথবা কয়েক জোড়া চোখের দৃষ্টি ঠিক এই মুহূর্তে তাকে লক্ষ করছে। তৈরি রাখছে সোডার বোতল কি হাতবোমা। হ্যাঁ, সত্যি সত্যি হতেই পারে এসব। - ভাবনাটা মাথায় আসতেই এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। বুকে দ্বিধা। পায়ে আড়ষ্টতা। এগোনো উচিত হবে ? না - হবে না ? দাঁড়িয়ে পড়ে চারপাশটা বার কয়েক ভালোভাবে দেখে নিল তাই। না, কাউকে চোখে পাড়ছে না। তবু সতর্ক দৃষ্টি রেখে একটা গলির মধ্যে ঝট করে ঢুকে পড়ল পার্থ।

এই গলি দিয়ে বাড়িতে একটু কম সময়ের মধ্যেই পৌঁছানো যায়। দিনের বেলায় এ পথে যাতায়াত থাকলেও রাতের বেলায় সাধারণত পথটা এড়িয়ে চলে অনেকেই। পার্থও এড়িয়ে চলে সচরাচর। কেননা, রাতে বড্ড নির্জন হয়ে পড়ে গলিটা। আলোও থাকে না তেমন। আজও নেই। তবে অচিরেই স্বস্তি পেল সে। যা আশঙ্কা করেছিল, তা নয়। কেউ ওঁৎ পেতে নেই এ গলিতে। পথ নির্জনই। এ পথটুকু পেরিয়ে যাবার পর পুব-পশ্চিম বরাবর একটা সরু রাস্তা পড়বে। রাস্তাটা পেরিয়ে আবার একটা গলি। সে গলিটা পেরিয়ে খানিকটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে কী একটা কারখানা তৈরি হতে হতে অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে বহুদিন। তার ঠিক উল্টো দিকের বাড়িতে থাকে কোয়েলরা। ওদের বাড়িটা ছাড়িয়ে বেশ কিছুটা দূরে পার্থদের বড়ি। মাঝখানের পথটুকু হেঁটে যেতে যেতে প্রথমে পেরোতে হয় নন্তুদের পার্টি-অফিস, ক্লাব ঘর, গোটা কয়েক মুদিখানা আর চায়ের দোকান। তারপরে সেই বহুতল ফ্ল্যাটটা, যেটার একটা অংশ গতবছরে হঠাৎ ধসে গিয়ে পাঁচজনের মৃত্যু ডেকে এনেছিল।

গলি পেরিয়ে পুব-পশ্চিমে চলে যাওয়া সেই রাস্তাটাতে পা রাখতেই যেন জমে গেল পার্থ। আলোয় মাখামাখি রাস্তাটার ওধারে দাঁড়িয়ে সকালের সেই ছেলেটি। সঙ্গে আরও কয়েকজন। এরাই তাহলে আজকের রাতের নায়ক ! মনের ভিতরে সেই ভয়টার স্পর্শ পেল পার্থ। তীব্র একটা শিরশিরানি শরীরটাকে হিম করে দিয়ে নিচু থেকে উপরের দিকে উঠে গেল যেন। আর তখনই, ঠিক তখনই - সেই চড়াইপাখিটার ডাক যেন সে শুনতে পেল কানের কাছেই। সেই পাখিটা, যেটা তাদের ঘরের ভেন্টিলেটারের মধ্যে বাসা বেঁধে থাকত আর কিচির কিচির করে ডাকত সারাক্ষণ। এক ঝড়ের রাতে মরে যাওয়া পাখিটার ডাক ! কেমন যেন গম্ভীর আর অশরীরী কিচির কিচির। যেন মৃত পাখিটা তার চারপাশে বৃত্তাকারে উড়ছে। উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে।

মৃত্যুভয়ের সঙ্গে ইতিপূর্বে পার্থর পরিচয় নেই যদিও, তবু সে সেরকমই একটা কিছু অনুভব করল। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ওদের কয়েকজনের হাতে রিভলবার। দৃষ্টি ফেরানো এদিকেই। হঠাৎ সেই ছেলেটি তার সঙ্গীদেরকে কী যেন বলল। কী বলল কে জানে ! সবাই একসঙ্গে এগিয়ে আসতে লাগল এদিকে। ঠিক ওই মুহূর্তেই পার্থর মনে পড়ে গেল, সকালে সে এই ছেলেগুলোর উপরে মেজাজ দেখিয়েছিল, প্রতিবাদ জানিয়েছিল ওদের কাজের। মনে পড়তেই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল সে। ছেলেগুলোর হয়তো সে কথা মনে

পড়ে গেছে। হয়তো সেজন্যেই তার দিকে এগিয়ে আসছে এখন। অনেকখানি এগিয়ে এসেছেও। সুতরাং বিপদ বুঝে সে পিছু হটতে শুরু করল একটু একটু করে। ওদের মতিগতি মোটেই ভালো ঠেকছে না তার। কখন কী করে বসবে তার ঠিক আছে ?

সতর্ক পায়ে খানিকটা পিছিয়ে গিয়েই পার্থ পৌঁছে গেল গলির মুখে। তারপর দ্রুততার সঙ্গে ঘুরে গিয়ে তীর খাওয়া হরিণের মতো দৌড় লাগাল সামনের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে মুখে অদ্ভুত একটা শব্দ করে দৌড়ে এল ছেলেগুলো। পরক্ষণেই গলির মুখে শব্দ আর ধোঁয়া। বোমা ফাটল দু'টো। একটু ভিতরের দিকে আরও একটা। সঙ্গে ছুটল গুলি।

পর পর তিনটে বোমার শব্দে আর গুলির শব্দে হতচকিত হয়ে যাওয়ায় শ্লথ হয়ে পড়েছিল গতি। তবু পার্থ একেবারে থেমে গেল না। তাড়া খাওয়া জন্তু ধরা পড়ার আগের মুহূর্তে যেভাবে দৌড়ায়, সেভাবে দৌড়াতে দৌড়াতে সে পৌঁছে গেল বড় রাস্তায়। আর ঠিক তখন অন্ধকার ফুঁড়ে দ্রুত কাছে চলে এল কয়েকটি ছায়ামূর্তি। এসেই ঘিরে ধরল তাকে।

প্রথমে ভেবেছিল মানিকতলা থানার পুলিশের হাতে পড়েছে। কিন্তু ভুল ভাঙল মানিকতলা পেরতে দেখে। আর তখনই পার্থর কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল আজকের হাঙ্গামার ব্যাপকতা কতখানি। গাড়ি তাকে নিয়ে চলেছে খোদ লালবাজারের দিকেই।

গাড়ির ভিতরে অফিসারদেরকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে চেয়েছিল পার্থ। কিন্তু তার বক্তব্য আমল পায়নি কারুর কাছে। লালবাজারেও জেরার মুখে সে সত্যি কথাই

বলল। তবু সেই একই অবিশ্বাস।

- তা হলে বলতে চাইছেন আপনি কোনও ভাবেই ওই ঘটনার সঙ্গে জড়িত নন ?

- আমি তো সব আপনাদের বলেছি।

- হ্যাঁ, বলেছেন। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করিনি। বিশ্বাস কেন করিনি - এ প্রশ্ন করবেন না। তবে আমার পরামর্শ যদি মানেন তো বলব - সত্যিটা বলুন। তাতে আমরা আপনাকে সাহায্য করতেও পারি।

- বিশ্বাস করুন, আমি...। ওরা আমাকে তাড়া করেছিল বলেই...

- আপনি ছুটছিলেন। আর তাই পুলিশ আপনাকে ধরেছে - এই তো ? বাহ্, দারুণ ! শুনতে ভালো লাগছে। চালিয়ে যান, চালিয়ে যান। আপনার হবে।

- আমার কথা আপনারা কেন বিশ্বাস করতে চাইছেন না বলুন তো !

- কী করে বিশ্বাস করব ? দ্বাপর যুগের যুধিষ্ঠির সত্যি কথা বলত শুনেছি। কলিযুগের যুধিষ্ঠিরদের এখনও দেখা পাইনি যে ! আপনি বলে যান। আমরা মিথ্যে শুনতে অভ্যস্ত আছি।

এবার যেন গা জ্বলে গেল পার্থর। সে সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রূপ মেশানো গলায় বলে উঠল, সরি স্যার। আমার জানা ছিল না যে আপনাদের মতো লোকের সঙ্গে সত্যি কথা না বলাই ভালো। জানা থাকলে আমিও না হয় মিথ্যে বলার চেষ্টা করতাম।

সজোরে টেবিল চাপড়ে গর্জে উঠলেন অফিসার, শাট আপ ননসেন্স। বোমাবাজি করে আবার বড় বড় কথা !

- মোটেই বোমা ছুড়িনি আমি। আপনারা মিথ্যে বলছেন।

- মিথ্যে বলছি ? হ্যাঁ, আমরা মিথ্যে বলছি। পুলিশ রিপোর্ট মিথ্যে বলছে আর তুমি সত্যি বলছ, তুমি ! - একেবারে 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে। তাতেও থামার লক্ষণ নেই, ওয়েল। তোমাদের মতো অ্যান্টিসোসালদের কী করে শায়েস্তা করতে হয়, তা আমার জানা আছে। - উত্তেজিত অফিসার কলিংবেলটা টিপতেই একজন কনস্টেবল স্যালুট করে এসে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে হুকুম হয়ে গেল, এই ইডিয়টটাকে লক আপে পুরে দাও। পরে এর ব্যবস্থা করছি।

পার্থ ভয় পেল না একটুও। কনস্টেবলের সঙ্গে অনেকটা স্বাভাবিকভাবেই হেঁটে গেল লক আপের দিকে। ভিতরে ঢুকে অবশ্য ভাবনাটা এলই। নিজেকে নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু মা ? একটা রাতও সে বাড়ির বাইরে থাকলে মায়ের চোখে যে ঘুম আসে না ! আজও মায়ের চোখের ঘুম উধাও হয়ে যাবে। মুখে কিছু উঠবে না। শান্তা অবশ্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবে খাওয়াবার। হয়তো মাকে রাজি করাবার জন্যে অনুযোগ তুলবে, আমি-পিয়াল কেউ না, দাদাই যেন তোমার সব ! - তবু মা পথের দিকে তাকিয়ে প্রতীক্ষা করে থাকবেই। অসুস্থ মায়ের সেই কষ্টের কথাই ব্যথা হয়ে বুকে বাজছিল পার্থর। মা তো আর জানে না তার ছেলে লক আপে রাত কাতরাচ্ছে ! বাবা আর শান্তার কথাও মাথায় এল তার। বাড়িতে যার ফিরবারই কথা, সে ফিরল না কেন - এ ভাবনা আসবেই সবার। বাবা হয়তো খুঁজতে বেরোবেন। কোয়েলদের বাড়িতে শান্তা অন্তত একটিবার যাবেই। খবরটা শোনার পরে কোয়েলের একই অবস্থা হবে নির্ঘাৎ। দুশ্চিন্তায় ভুগবে সারারাত।

মনটা দমে গেল অনেকখানিই। সে বুঝতে পারল, অফিসারের সঙ্গে ওভাবে কথা বলা

উচিত হয়নি তার। নির্দোষকে দোষী সাজানো পুলিশের কাছে জলভাত। একটা না একটা মিথ্যে কেস চাপিয়ে দিলেই তো হয়ে গেল। কোর্ট-কাছারি করবে কে ? টাকাই বা কোথায় ?

নানান ভাবনার সাগরে ডুবতে ডুবতে এবং কিছুটা তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থার ফাঁকে কখন যে ভোর হয়ে গেছে, খেয়াল করেনি। খেয়াল হতে দেখল দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে বসেই শেষরাতে সে চোখের পাতা এক করেছে। - কখন, কোন ভাবনার শেষে মনে পড়ল না এখন। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে অনুভব করল, কোমরে ব্যথা ব্যথা ভাব। তা ছাড়া সারা শরীরে বিক্ষিপ্ত কয়েকটা চাক চাক দাগ। সেই সঙ্গে স্পর্শকাতর জ্বলুনি। তার মানে মশার দল হার্পুন চালিয়েছে ইচ্ছে মতোই। - এসবই থানায় তার প্রথম রাত্রিবাসের চিহ্ন, এক অন্য অভিজ্ঞতা।

গতকাল রাতে খিদে ছিল না। খেতেও ইচ্ছে হয়নি। কিন্তু এখন খুব খিদে পেয়েছে। উঠে দাঁড়াতেই খিদের পরিমাণটা জানান দিল শরীর। গলাটাও খুক খুক করছে। ঠাণ্ডা লেগে থাকবে গতকাল। একটা সিগারেট কিংবা বিড়ি খেতে পারলে ভালো হত কিংবা এক কাপ চা। - ভাবছিল পার্থ। হঠাৎ কী একটা শব্দ হতেই ফিরে তাকাল সে। গতরাতের সেই কনস্টেবলটি। তালা খুলে ফেলেছে এরই মধ্যে।

ডাকল, আসুন।

- কোথায় ?

- স্যার ডাকছেন।

- তার মানে আবার সেই সত্যি-মিথ্যের যাচাই তো ?

- আহ্ ! কথা বাড়াবেন না। আসুন আমার সাথে। বলল কনস্টেবলটি।

পার্থ আর কথা না বাড়িয়ে অনুসরণ করল তাকে। সে ধরেই নিল আবার এক প্রস্থ জেরার মুখোমুখি হতে হচ্ছে তাকে। নতুবা অফিসারটি তাকে শায়েস্তা করতে

জোরালো একখানা কেস সাজিয়েছেন। - হা ভগবান, এরা জানে না এরা কী করছে। এদের তুমি ক্ষমা কোরো। পার্থ হেসে ফেলল। কী অনিন্দ্যসুন্দর ভঙ্গিমায় মহাত্মা যিশু তাঁর হত্যাকারীদের জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। নিজেকে যিশুর সঙ্গে তুলনা করা যদিও তার সাজেই না ; তবু বক্তব্যটা উভয় ক্ষেত্রেই কত বাস্তব ! আর এই বাস্তব কথাটা ঠিক এই সময়েই তার মনে এল !

আবার সেই একই ঘরে। একই অফিসারের মুখোমুখি। টেলিফোনে কথা বলছিলেন অফিসারটি। পার্থকে দেখে ইশারায় সামনের চেয়ারটা দেখালেন।

পার্থ অবশ্য বসল না, দাঁড়িয়েই রইল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগল এপারের সংলাপ। আগের কথাবার্তার কিছুই সে জানে না। অতএব প্রথম দিকে কিছুই তেমন বুঝতে পারল না সে। তবু শুনতে লাগল -

- ঠিক আছে, আমি দেখছি। - না, না। ও নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না। আমার হাতে কেস যখন - কী বলছেন ? - হ্যাঁ, হ্যাঁ। ও বলেছে। কিন্তু দেখবেন, ভবিষ্যতে আবার - মানে, বুঝতেই পারছেন, তাতে আপনারও গুডউইল নষ্ট হবে, এদিকে আমারও --।

পার্থর সন্দেহ হল, বোধ হয় তাকে নিয়েই কথাবর্তা চলছে কারুর সঙ্গে। কিন্তু সে ভাবনা বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না তার মনের মধ্যে। কারণ তার হয়ে লালবাজারে ফোন করবে কে ?

- কী হল, দাঁড়িয়ে রইলেন যে ? বসতে বললাম না ?

চমকে উঠে পার্থ ফিরে তাকিয়ে দেখল, সেই অফিসারটি এবার তার দিকে ফিরেছেন।

- বসুন। রীতিমতো ধমকের সুরে বললেন অফিসারটি। পার্থ কি সেই ধমকে কেঁপে গেল একটু ? কে জানে ! তবে আর দ্বিধা না করে বসে পড়ল টেবিলের সামনে পাতা একটা চেয়ারে।

- কী যেন নাম আপনার ? ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। পার্থ। তা পার্থবাবু, আপনি যেন কোন ক্লাবে খেলেন বলেছিলেন ?

- অভিযান ক্লাব।

- স্ট্রাইকার ?

- হ্যাঁ।

- ক্লাবের সেক্রেটারি কে ? তার ফোন নম্বর জানা আছে ?

- আছে।

- নাম কী ভদ্রলোকের ?

- মানব পাল।

- নাম্বারটা ?

- টু ফোর থ্রি...

- এক মিনিট -। অফিসারটি রিসিভার তুলে ডায়াল করতে থাকলেন। ... হ্যালো, লালবাজার থেকে বলছি। মানববাবু আছেন ? - ও, আপনিই ? শুনুন, একটা কেসের ব্যাপারে আপনার সাহায্য চাই। - আরে না, না। আপনি ঝমেলায় পড়বেন কেন ? আমি শুধু কতকগুলো কথা জানতে চাই। ঠিকঠাক উত্তর পেলেই চলবে। আপনি শুধু আমায় বলুন, পার্থ নামে কাউকে আপনি চেনেন কি ? আই মিন এই নামে কোনও ফুটবলার আপনাদের ক্লাবে খেলে কি না - কী বলছেন ? - আচ্ছা, আচ্ছা। ও শেষ কবে ক্লাবে গেছিল একটু খোঁজ নিয়ে যদি জানান - ও। - তাই ? - হ্যাঁ, ওই নামে একজনকে হাঙ্গামার দায়ে তুলে আনা হয়েছে। - দেবো ওকে ? - আচ্ছা, ধরে থাকুন।

দিচ্ছি - ।

রিসিভারটা তিনি এগিয়ে দিলেন পার্থের দিকে ।

- নিন । কথা বলুন ।

হ্যালো - মানুদা, আমি পার্থ বলছি । এই দেখুন না, প্র্যাকটিস সেরে বাড়িতে ফিরছিলাম । আর পুলিশ আমাকে - । - আরে না, না । স্রেফ সন্দেহ করে ধরেছে । আরও কিছু বলতো হয়তো পার্থ ; কিন্তু তার আগেই হাত বাড়ালেন অফিসার । মুখে বললেন, দিন । তারপর রিসিভারে একটা ধন্যবাদ জ্ঞাপক শব্দ উচ্চারণ করে নিজেই নামিয়ে রাখলেন সেটা ।

- বিকাশবাবু কে হন আপনার ?

- কে বিকাশবাবু ?

- স্ট্রেঞ্জ ! এম.পি. বিকাশ সেনকে চেনেন না আপনি ? অথচ উনিই আপনার জন্যে ওকালতি করলেন !

ঠিক কী বলা উচিত ভেবে পেল না পার্থ । তবে বুঝতে পারল তার হয়েই বিকাশ সেন টেলিফোন করেছিলেন থানায় । স্বভাবতই মানুষটির প্রতি কৃতজ্ঞতায় মনটা ভরে উঠল তার ।

সে বলল, উনি আমাদের এলাকারই এম.পি.

অফিসারটি কী বুঝলেন কে জানে ! বললেন, আই সি । ঠিক আছে, আমি আটকচ্ছি না । যান, বাইরে একজন আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন । গিয়ে দেখা করুন । তবে একটা কথা, ভবিষ্যতে এরকম কোনও হাঙ্গামায় আবার জড়িয়ে পড়লে কিন্তু... । আমি কী বলতে চেয়েছি, নিশ্চয় তা বুঝতে পেরেছেন । - যান ।

তার মানে মুক্ত সে ! পার্থ বিস্মিত, মুগ্ধ। বাইরে যাবার জন্যে পা বাড়াতেই পিছন থেকে অবশ্য ডাক এল আবার, শুনুন।

পার্থ দাঁড়িয়ে পড়ে ফিরে তাকাল।

- কোন পজিসনে খেলেন যেন বলেছিলেন ?

- স্ট্রাইকার।

- স্টপার নয় ? আমি এক সময় স্টপার হিসেবে খেলতাম জানেন তো ! যদিও কখনও ফার্স্ট ডিভিশনে খেলিনি, তবে খেলতাম খারাপ না। - বলে হাসলেন ভদ্রলোক। এই প্রথমবার অন্তত। পরে বললেন, আপনাদের ক্লাবের সেক্রেটারি বলছিলেন আপনি নাকি খুব ভালো ফুটবল খেলেন। তাহলে কেন ইস্টবেঙ্গলে খেলেন না ? ইস্ট বেঙ্গল তো খুব ভালো খেলছে আজকাল।

ভিজিটিংরুমে আসতে আসতে পার্থ ভাবছিল - কে আসতে পারে তার সঙ্গে দেখা করতে ? বাবা ? শান্তা ? নাকি -। ধ্যুস্, তা কী করে হবে ! কেউ তো জানেই না যে, সে থানাতে। তাহলে ?

মানুষটিকে দেখবার জন্যে জোরে জোরে পা চালিয়ে এল পার্থ। এসেই খানিকটা যেন

হতভম্ব হয়ে গেল।

কোয়েল !

ততক্ষণে বসা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে কোয়েল। দ্রুত পায়ে কাছে চলে এল এবার।

- কেমন আছ ?

কোয়েল যে খুব স্বাভাবিক গলায় কথা বলেনি, পার্থ বুঝতে পারল তা। ঠোঁট কাঁপছিল কোয়েলের। প্রাণপণে নিজেকে সামলে রাখার চেষ্টা করছিল। সে যেন কচুর পাতার মাঝখানে জমে থাকা খানিকটা জল, একটু টোকা লাগলেই ঝরে পড়বে মাটিতে।

পার্থ তাই যতটা সম্ভব স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে বলল, ঠিক আছি আমি।

- ওরা কি তোমাকে...।

- মেরেছে কি না তাই জানতে চাইছ তো ? মারবে কেন ? আমি কি চুরি করেছি - না ডাকাতি !

- সত্যি তো ?

- আরে বাবা হ্যাঁ। গায়ে হাত দেয়নি, তবে জেরা করেছিল।

কোয়েল চোখ মুছে বলল, বউদিকে বলে বড়দাকে কোর্টে পাঠিয়েছি। যদি জামিন হয়...

- জামিন ! জামিন কী হবে ? এরা তো আমায় ছেড়ে দিয়েছে। খানিকটা অবাক হয়ে বলল পার্থ।

কোয়েলও অবাক।

- ছেড়ে দিয়েছে !

- হ্যাঁ।

- ধ্যেৎ ! ইয়ার্কি মারছ। এ সময় ইয়ার্কি ভালো লাগে ?

- ইয়ার্কি না কোয়েল। সত্যি। ছেড়ে না দিলে এভাবে তোমার সামনে এসে দাঁড়াতে পারতাম ?

কথাটা সত্যি - বুঝল কোয়েল। সে কয়েক মুহূর্ত এক দৃষ্টিতে পার্থর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর স্বস্তির একটা মৃদু নিঃশ্বাস ফেলে হাত ধরল পার্থর। বলল, তাহলে চল, বাড়ি যাই।

থানা থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে প্রথমেই বাসে উঠল না ওরা। ইচ্ছে করেই। পাশাপাশি হাঁটতে লাগল দু'জনে।

কোয়েল একেবারে চুপচাপ। স্বাভাবিক হতে যেন সময় নিচ্ছিল ও। আড় চোখে সেটা লক্ষ করে পার্থই এক সময় মুখ খুলল আগে, তোমরা খবর পেলে কী করে ? পুলিশ তো আমাকে আচমকাই রাস্তা থেকে তুলে নিয়েছিল, তখন তো সেখানে চেনাজানা

কেউ ছিল না ! কে খবর দিল তোমাদের ? পুলিশের লোক ?

- পুলিশের কী দায় পড়েছে ?

- তবে ?

- নন্তুদা।

- নন্তু ! ও ছিল নাকি তখন ওখানে ?

- নিশ্চয় ছিল। না থাকলে জানল কী করে ?

আবার এ-ও হতে পারে - নন্তু হয়তো ছিল না। হয়তো অন্য কেউ ঘটনাটা দেখে খবর দিয়েছিল নন্তুকে। তারপর... পার্থর সামনে পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার হতে থাকল ক্রমশ। সে মোটামুটি নিশ্চিত হল - বিকাশ সেনকে বলে লালবাজার থেকে তাকে পরোক্ষে ছাড়িয়ে এনেছে নন্তুই। সুতরাং উভয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মনটা ভরে উঠল তার। কিন্তু আরেকটা ব্যাপারে তার বেশ অবাক লাগছিল। তাই বলল, নন্তু আমাদের বাড়িতে খবর দেয়নি ?

কোয়েল এবার ফিরে তাকাল পার্থর দিকে, দিয়েছিল তো ! আমিও আসার সময় গেছিলাম তোমাদের বাড়িতে।

- তো ?

- কেউ এল না কেন তাই ভাবছ তো ? শান্তা আসতে চেয়েছিল। কিন্তু তোমার বাবা বারণ করলেন, তাই আর এল না।

- ও। পার্থর মুখখানা আষাঢ়ে মেঘ হয়ে গেল যেন। একটু দুঃখ পাওয়া গলায় সে বলল, বাবা নিশ্চয় ভেবেছে আমি মারামারি করতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছি। বেকার ছেলে তো, অনেক কিছুই করতে পারি ! চুরি-ডাকাতি-গুণ্ডামি-ছিনতাই --।

ওভাবে বলছ কেন ? ছি ! কোয়েলের গলায় তীব্র ভর্ৎসনার সুর। সে প্রায় একই ভঙ্গিতে বলল, তুমি কি জানো মাসিমা অসুস্থ ?

পার্থ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। পায়ে যেন পাথর চাপা ভার। মা অসুস্থ ! মা ?

তার মনের অবস্থাটা অনুমান করে কোয়েল তখনই বলল, অত ভেঙে পড়ার মতো কিছু হয়নি। জ্বর হয়েছে একটু। নন্তুদাটা এমন বোকা, গিয়ে বলবি না বল মাসিমার সামনেই। শুনে যা হয়, সারা রাত কান্নাকাটি - না খাওয়া-দাওয়া। ওষুধও খাননি পর্যন্ত। শেষরাতের দিকে জ্বর এসেছিল। সকালেও দেখে এলাম এক'শ দুইয়ের নিচে নামেনি। ডাক্তারখানায় নিয়ে যেতে হবে বলে আমার সাথে শান্তা এল না আর। মেসোমশাইও বোধ হয় যাবেন ডাক্তারখানায়। - কোয়েল বলেই চলল, উহ্, কী ছেলে রে বাবা ! কারুর জন্যে কোনও চিন্তা নেই ! মাসিমা, মেসোমশাই, আমি - আমরা সবাই ভেবে মরি, তাতে কার কী ? মাঝরাতের আগে তবু ফেরার নাম নেই। বীরত্ব না দেখালেও চলে না। কে বলেছিল ওই অবস্থায় বাড়ি থেকে বেরোতে ? সন্ধ্যে থেকেই গুলি-গোলা-বোমাবাজি চলছে, উনি ফিরলেন তো ফিরলেন সেই মাঝরাতেই !

একবারও বাধা দেবার চেষ্টা করছিল না পার্থ। একনাগাড়ে অনেক কথাই বলে যাচ্ছে কোয়েল। নরমে-গরমে-অভিমানে। বলুক। বলে হালকা হোক। রাগ দেখাক আরও। গলে জল হয়ে যাক মনের মধ্যে জমে থাকে দুশ্চিন্তার হিমপ্রাচীর।

- পুলিশের হাতে পড়েছিলে বলে তবু বাঁচোয়া। ওরকম গুলি ছোড়াছুড়ি-বোমাবাজির মধ্যে যদি কিছু হয়ে যেত !

কোয়েলের আশঙ্কাটা অমূলক না। হতেই পারত কিছু একটা। অসম্ভব কী ? তবু, সব বুঝেও, ব্যাপারটা হালকা করে দিতে চাইল পার্থ, ধুর ! কী আর অত ? ওরা আমার নাগাল পেলে তো ! ওদের মতলব বুঝতে পেরেই তো আমি দৌড় দিয়েছিলাম। আর

দৌড়ে আমাকে ধরা ? তুমি জানো না কোয়েল, আমার কাছে একটা সার্টিফিকেট আছে। ক্লাস নাইনে থাকতে একবার এক রেস কম্পিটিশনে আমি ডিস্ট্রিক্ট চ্যাম্পিয়ান হয়েছিলাম।

গেট দিয়ে ঢোকার মুখে আচমকা পিয়ালের সঙ্গে দেখা। কোথাও বেরোচ্ছিল হয়তো। পার্থকে দেখতে পেয়েই প্রায় বিদ্যুৎ গতিতে ফিরল সে, মা, দাদা এসেছে - দাদা -

খবরও ছড়ায় যেন বায়ুর গতিতে। দেখতে দেখতে তাই যেন কৌতূহলীদের ভিড়। দোতলা থেকে নেমে এল বাড়িওয়ালার দুই মেয়ে রিমকি আর ঝিমকি। রমলা বউদি নিচের তলার বাসিন্দা। পার্থদের পাশের ঘর। অবাঙালি বউটাও। - সবাই চলে এসেছে।

শোবার ঘরে এসেও রেহাই মিলল না পার্থর। এ ও নানান প্রশ্ন ছুড়ে যাচ্ছে। উত্তর দিতে হচ্ছে সব প্রশ্নের।

আর সবার ভিড়ে কোয়েল যেন হারিয়ে গেছে। ওকে প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। অথচ ও-ই তো তাকে লালবাজার থেকে বাড়িতে নিয়ে এল। বেচারি কোয়েল। ওকে কেউ গুরুত্বই দিচ্ছে না !

কোয়েলের দেখা না মিললেও শান্তার দেখা মিলল অবশ্য। অবাঙালি বউটার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে দরজার পাশে। কিন্তু নির্বাক।

পার্থর মনে পড়ল বাড়িতে সে ঢোকামাত্র ছুটে এসেছিল শান্তা। কিন্তু তারপর থেকে

একবারও কথা বলেনি সে। কাছেও আসেনি। কারণটা ভেবে পাচ্ছিল না পার্থ। থানাতে তার সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারেনি বলে একটা অপরাধবোধ কাজ করে থাকতে পারে কিংবা দাদার প্রতি তীব্র অভিমানের একটা পাথরচাপা ভার মনের মধ্যে চেপে বসে থাকতে পারে। মোটকথা একটা না একটা কিছু হয়েছে নিশ্চয়। একটু বাদে সবাই এক এক করে চলে গেল বাইরে। শান্তাও যাচ্ছিল। শরীরটাকে বিছানায় আধা এলিয়ে দিয়ে হাত তুলে পার্থ সে কারণে ডাকল বোনকে, এই শান্তা, শোন।

শান্তা এল ঠিকই ; কিন্তু একেবারেই চুপচাপ।

- কী হল তোর ? কথা বলছিস না যে !

- এমনি। হালকাভাবে শান্তা বোঝাল বটে কিছু হয়নি ; কিন্তু সে জানে গতকাল রাতে নন্তুদা এসে খবরটা দেবার পর থেকে তার মনের অবস্থাটা কোন পর্যায়ে আছে। প্রথমটায় তো বিশ্বাসই করতে চায়নি সে। তাই বলেছিল, যাহ্, বাজে কথা। তুমি ইয়ার্কি মারছ।

নন্তুদা বলেছিল, না রে, সত্যি।

সত্যি ! ভয়ে-বিস্ময়ে মুখ শুকিয়ে গেছিল তার। বুকের ভিতরে যেন ঢড়াস্ ঢড়াস্ শব্দ।

- তা হলে কী হবে !

- কী আবার হবে ? পার্থ তো সত্যি কিছু করেনি ! খুব বেশি হলে পুলিশ ওকে খানিকটা হ্যারাস করতে পারে। তার বেশি কিছু তো করতে পারবে না !

- ওরা যদি মিথ্যে কেস সাজিয়ে দাদাকে ফাঁসিয়ে দেয় ?

- পারবে না। চাইলেই পুলিশ সব কিছু করতে পারে নাকি ?

- পারে, পারে। ওরা সব পারে। তুমি একটু দ্যাখো নন্তুদা। তোমার তো অনেক জানা-শোনা আছে। একটু দ্যাখো প্লিজ ! নইলে মাকে যে সামলাতে পারব না।

তার অনুরোধটা নন্তুদা রেখেছে শেষপর্যন্ত। বিকাশ সেনের প্রভাব কাজে লাগিয়ে চাড়িয়ে এনেছে দাদাকে। বাড়িতে ফিরে এসেছে দাদা। তা বলে কি দুশ্চিন্তা মন থেকে পুরোপুরি লোপ পেয়ে গেছে ? মোটেই না। বরং দুশ্চিন্তাটা রূপ বদলে পরিণত হয়েছে অভিমানে। তাই যেন দাদার কাছে আজ অল্প কথার মানুষ সে।

পার্থ অবশ্য বুঝতে পারল বোনের অভিমানের ব্যাপারটা। সে কারণে বলল, রাগ করেছিস, না ?

তার উত্তরে শান্তা শুধু সংক্ষেপে জানাল, না।

- তা হলে এমন গোমড়ামুখী হয়ে আছিস কেন শুনি ?

- এমনি।

- এমনি না হাতি। তুই নিশ্চয় আমার উপরে রাগ করেছিস।

- বললাম তো, না।

- না বললেই হল ! আমি বুঝি কিছু বুঝি না ? আরে, যাচ্ছিস কোথায় ? শোন না। এই !

শান্তা সত্যি সত্যিই চলে যাবার জন্যে উদ্যত হয়েছিল। দাদার ডাকে দাঁড়িয়ে পড়ল আবার।

- বাবা কি অফিসে ?

- না।

- তবে ?

- থানায় গেছে।

- থানায় ! কোন থানা ?

- লালবাজার।

বাবা লালবাজারে গেছে ! পার্থ কিছুটা অবাকই হল যেন। কিন্তু এ-ও বুঝতে পারল, তার জন্যেই থানায় গেছে বাবা। তাকে বাড়িতে নিয়ে আসার জন্যেই হয়তো। বাবা তো আর জানে না - অনেক আগেই ছাড়া পেয়ে গেছে সে ! বাবার জন্যে তাই মনে মনে খানিকটা কষ্টই অনুভব করল পার্থ। এবং মনে আরেক জিজ্ঞাসা মাথা চাড়া দিল, বাবা কি জানত - আজই ছাড়া পাবে সে ? নন্তুও কি জানত তা ? সে আর ও ব্যাপারে কথা বাড়াল না। প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে শুধু জানতে চাইল, মা কেমন আছে এখন ?

- ভালো না।

- জ্বর কমেছে ?

- ন।

পার্থ উঠে পড়ল বিছানা থেকে। মায়ের ঘরে গিয়ে দেখল কোয়েল রয়েছে সেখানে। বাড়িতে ফিরে যাবার আগে দেখা করতে এসেছে মায়ের সঙ্গে।

- মা, ও মা -। মাকে গভীরভাবে ডাকল পার্থ। অন্তর থেকে ডাকল। আগ্রহভরে ডাকল।

সে ডাকে সাড়া দিলেন না মনোরমা। বরং দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

- তুমি কি আমার উপরে রাগ করেছ ? মা গো ! তাকাও আমার দিকে। তাকাও।

খানিকটা জোর করে মায়ের মুখটা তার দিকে ফিরিয়ে আনতে গিয়ে হতভম্ব হয়ে গেল পার্থ।

মায়ের চোখে জল !

নিজের চোখ দু'টো সঙ্গে সঙ্গে ছল ছল করে উঠল। মায়ের কান্না সে সহ্য করতে পারে না একদমই। মা কাঁদলে যে বুকের মধ্যে উথাল ওঠে !

সে তাড়াতাড়ি নিজের চোখের জল মুছে নিয়ে বলল, কাঁদছ কেন ? পুলিশ তো আমাকে ছেড়ে দিয়েছে। হ্যাঁ, সত্যি। তবু কেন কাঁদছ ?

দুপুরের দিকে বিশেষ একটা ঘুমোয় না পার্থ। বেশিরভাগ দিনই সময় পায় না। আজ পেল। তাই ঘুমোল। আসলে খাওয়ার পর চোখের পাতা দু'টো আর স্থির থাকতে চাইছিল না। হাই উঠছিল বার বার। বিগত রাতটায় ঘুমের ঘাততিটুকু যেন শরীরটা পুষিয়ে নিতে চাইছে।

বিকেলে গেল নন্তুর খোঁজে। কিন্তু পাওয়া গেল না তাকে। কোথায় গেছে, বাড়িতে তা

বলেও যায়নি। সম্ভাব্য যেখানে যেখানে থাকতে পারে, তার কয়েকটা জায়গায় খোঁজ-খবর করার পর ভাসাদার চায়ের দোকানে চলে এল সে। সেখানেও নন্তু নেই।

শেষের বেঞ্চটাতে দিব্য, জীবন আর অপরিচিত একটি ছেলে বসে আছে।

তাকে দেখতে পেয়ে দিব্য বলে উঠল, এই পার্থ, কী খবর তোর ?

পার্থ এগিয়ে গেল ওদের দিকে।

জীবনও উৎসুক চোখে তাকিয়ে আছে।

শুনলাম তোকে নাকি পুলিশ তুলে নিয়ে গেছিল ? কী ব্যাপার ?

- কিছু না। এমনিই। পুলিশের কাজকর্মের ধরন তো জানিস। মাছ না পেয়ে ছিপে কামড় আর কী ! - ব্যাপারটা সে খুলেই বলল সবাইকে।

সব শুনে দিব্য বলল, তাই বল ! আমরা ভাবছিলাম কী না কী। হাজার হোক তোর মতো একটা ছেলে - ভাবা যায় না। না কি বল, জীবন ?

জীবন প্রথমে কিছু বলল না। পকেট থেকে বিড়ি বের করে ধরাল শুধু। ধোঁয়ার ভালো গোল্লা করতে পারে সে। গোটা কয়েক গোল্লা শূন্যে ছুড়ে দিয়ে মুখ খুলেই বলল, কাজটা বোধ হয় ভালো করলি না।

বুঝতে না পেরে পার্থ জানতে চাইল, কোনটা ?

- ঐ যে, ছেলেগুলোকে চটিয়ে দিলি। থানায় নামটাও তো থেকে গেল। মার্ক হয়ে গেলি না ?

ঠিকই। ঠিক কথাই বলেছে জীবন।

কিন্তু ঘটনাটার উপরে কতখানি আর হাত ছিল তার ?

- ছেলেগুলোকে চিনিস ? জানতে চাইল জীবন।

- দু-একজনকে তো মনে হয়েছিল মুখ চেনা।

-এখন তাদের দেখলে চিনতে পারবি ?

- কী জানি ! চিনতেও পারি, না-ও পারি হয়তো।

- ভালো করে দেখে থাকলে চিনতে পারারই কথা। অবশ্য ওই সময়ে কে আর সেদিকে খেয়াল রাখে !

- যার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়েছিল, তাকে দেখলে মনে হয় চিনতে পারব। ডান কপালে একটা কাটা দাগ ছিল ছেলেটার। তাছাড়া আগে কখনও দেখেছি বলে মনে হয়নি।

- হয়তো এ এলাকার কেউ না। বাইরের কেউ হয়তো।

কথা বলতে বলতে বিড়ি নিভে গেছিল। জীবন আবার ধরাতে গেল সেটাকে। দেশলাইয়ের খাপে কাঠি নেই দেখে ফেলে দিল আধখাওয়া বিড়িটা। পরে দেশলাইয়ের খাপটাও।

- চা খাবি ?

- আমি বলছি -।

জীবন হাতের মুদ্রা উঁচিয়ে বাধা দিল ওকে।

- ভাসাদা, তিনটেকে চারটে।

দিব্য বলল, ক'দিন ও রাস্তায় যাতায়াত করিস না, বুঝলি ?

- এটা একটা কথা নাকি ! এক-দু'দিন না হয় গেল না। কিন্তু কতদিন না গিয়ে পারবে ? তা ছাড়া ও রাস্তা দিয়ে না গেলেই যে ওদের সাথে দেখা হবে না - তা তো নয় ! অন্য কোনও ব্যবস্থা করতে হবে।

- বাদলকে ব্যাপারটা জানালে হয় না ?

- ধুর ! বাদল কী করবে ? ও তো নীরেন রায়ের কেনা গোলাম। ওকে দিয়ে হবে না। এক সুকু দত্তকে দিয়ে যদি কিছু হয়। ওঁরই তো পার্টির লোক !

বিকাশ সেনের প্রসঙ্গটা পার্থ আগেও যেমন তোলেনি, এখনও তুলল না। বিকাশ সেনকে পছন্দ করে না জীবন। তার কারণও অবশ্য আছে। অনেক দিন ধরে, অনেক কষ্টে পাড়ার দেওয়ালগুলোর সুস্থ-সৌন্দর্য সে ফিরিয়ে দিয়েছিল রঙে-রেখায়। মুছে দিয়েছিল ভোট-সর্বস্ব স্লোগানগুলো। পরের মাসেই সেসব বিদায় করে দিয়েছিলেন ওই বিকাশ সেন।

জীবন বলল, তুই সুকু দত্তের সাথেই দেখা কর, পার্থ। কালই দেখা কর। এসব মামলা যত ঝুলিয়ে রাখবি, তত কিচাইন বাড়বে।

কী করা উচিত, সেটাই সমস্যা। নন্তুর সঙ্গে একবার অন্তত আলোচনা করা অবশ্যই দরকার। তাকে ছাড়িয়ে আনার ব্যাপারে মুখ্য উদ্যোগী তো ও-ই। ওর উপকার সে ভুলবে কী করে ?

পার্থ তাই বলল, দেখি কী করা যায়।

ফিরবার পথেও নন্তুদের বাড়িতে গেল পার্থ। তখনও ফেরেনি নন্তু। কী আর করবে সে। অতএব আবার বাড়ির দিকে। আর বাড়িতে ঢুকতে না ঢুকতেই এগিয়ে এল শান্তা, কোথায় গেছিলি ? নন্তুদা এসে খোঁজ করে গেল !

- নন্তু এসেছিল ! কখন ?

- এই তো খানিকক্ষণ আগে। বলে গেছে সন্ধের দিকে আবার আসবে। তোকে রেডি থাকতে বলেছে।

শান্তার কথা মতো সন্ধের সময় হাজির নন্তু। এসেই কোনও ভূমিকা না করে বলল, চল।

কোথায় যাবে, কেন যাবে কিছুই জানে না পার্থ। তাই জানতে চাইল, কোথায় ?

নন্তু হাত ধরে টানল, যাব এক জায়গায়। - চল না !

- মা'র হুকুম আছে রে, ছ'টার পরে বাড়ি থেকে একেবারেই বেরনো বন্ধ।

- আমার ওপরও হুকুম আছে যে ! তা-ও আবার ওপরওয়ালার হুকুম। যে করে হোক তোকে তার কাছে পৌঁছে দিতেই হবে।

- তোর ওপরওয়ালাটি কে ? বিকাশ সেন নিশ্চয়।

- এই তো চিনেছ গুরু ! তবে আর 'না' কেন ? চল, চল। দেরি করে লাভ কী ?

- মাকে বলে যাব না ? পার্থ ইচ্ছা-অনিচ্ছায় দুলছিল। কাল দিয়ে আজ দিয়ে যে ঝড়টা গেল !

নন্তু বলল, মাসিমা তো এখন ঘুমোচ্ছেন।

- ধ্যেৎ ! এখন ঘুমোবে কী ?

- ওই হল আর কি। শুয়ে তো আছেন ? তোকে গিয়ে আর কিছু বলতে হবে না। শান্তা তো জানে, ও-ই না হয় মাসিমাকে বলে দেবে তুই আমার সাথে গেছিস।

এরপর আর কিছু বলা যায় না। এ তো জানা কথা, নন্তুর সহযোগিতায় যেহেতু সে ছাড়া পেয়েছে, সেহেতু এ বাড়িতে নন্তুর প্রভাব আগের থেকে বেড়ে গেছে অনেকটাই। যার ফলে নন্তুই তাকে নিয়ে গেছে শুনলে ওর উপরে রাগ বা বিরক্তি কারুরই হবে না। কৃতজ্ঞতাও যে মানুষকে বশীভূত করে ! আর বশীভূত হবার মানে তো মুখ বুজে সব কিছুকে মেনে নেওয়া।

অতএব পার্থ সঙ্গী হয়ে গেল নন্তুর।

পৌঁছাতে মিনিট কুড়ি সময় লাগল ওদের। এতটা সময় লাগার কথা নয়, তা-ও লাগিয়ে দিল নন্তু। কালকের ঘটনাটা বলছিল সে। কীভাবে খুনের ঘটনা থেকে দু'পার্টির মধ্যে বোমাবাজি হয়ে গেল, ক'জন হসপিটালে গেল - এইসব।

কথা ফুরোতে ফুরোতেই রাস্তা কাবার।

'একান্ত আপন' লেখা বাড়িটার গেট-ঠেলে ভিতরে ঢুকে নন্তু ডাকল তাকে, আয়।

বাড়িটা অচেনা নয় পার্থর কাছে। তবে আসা-যাওয়ার পথে দেখেছে, ব্যস, এই পর্যন্তই। ভিতরে কখনও ঢোকেনি। গেট পেরিয়ে ভিতরে ঢুকে বেশ খানিকটা মুগ্ধ হয়ে গেল পার্থ। দারুণ সাজানো গোছানো ভিতরটা। সুন্দর একটা ফুলের বাগান তো আছেই। সে বাগানে শ্বেত পাথরের দু'টো পরী যেন সদ্য নেমে এসেছে পরী রাজ্য থেকে। বাগানের মাঝখান দিয়ে মোরাম ঢালা পথ। গেটের বাইরে দাঁড় করানো রয়েছে দু'খানা মারুতি। গাড়ি দু'টো হয় বিকাশ সেনের নয়তো কেউ এসেছে তাঁর বাড়িতে।

নন্তু পার্থকে নিয়ে যেভাবে ভিতরে ঢুকে গেল, তাতে স্পষ্ট যে, এখানে তার অবাধ দ্বার। ও কি বিকাশ সেনের খুব কাছের লোক ?

যা ভাবা গেছিল, তা-ই। ঘরের মধ্যে ছ'জন বসে আছে। আলোচনা চলছে জোর কদমে। মাঝে মাঝে তর্কাতর্কি। বিষয় রাজনীতি। শুনতে ভালো লাগছিল না পার্থর। তার কাছে রাজনীতির মতো নীরস বিষয় আর নেই। সোফায় বসে অপেক্ষা করতে করতে সে তাই অন্যমনস্কভাবে ঘরের আসবাবপত্রগুলো দেখতে লেগে গেল।

তারপর কখন যে আলোচনা থেমেছে, খেয়াল করেনি সে। খেয়াল ফিরল নন্তুর ডাকে।

দৃষ্টি ফেরাতেই বিকাশ সেনের চোখে চোখ পড়ল তার। বিনিময়ে মৃদু হাসলেন বিকাশ সেন। কেমন যেন পরিচিত পরিচিত হাসি।

সমবেত সকলের উদ্দেশে তারপর বললেন, আচ্ছা, এবার এমন একজন সংগ্রামী মানুষের সাথে আপনাদের পরিচয় করাব, যিনি পার্টির স্বার্থে নিজের জীবনকে পর্যন্ত বলি দিতে উদ্যত হয়েছিলেন। আমাদের মধ্যে আজ তিনি উপস্থিত আছেন। তিনি হলেন - এই পার্থ বসু।

বিকাশ সেনের তুলে ধরা আঙুল বরাবর সকলের দৃষ্টি এবার ফিরল পার্থর দিকে।

কিন্তু থামার কোনও লক্ষণ নেই বিকাশ সেনের, বন্ধুগণ, আপনারা নিশ্চয় জানেন যে

ইদানীং জনগণের চাপে কোণঠাসা বিরোধী পার্টির লোকজন ব্যাপকভাবে সমাজবিরোধী কার্যকলাপ শুরু করে দিয়েছে। এটা গুরুতর অন্যায়। জনগণ এতে বিরক্ত হচ্ছে। বিরূপতা সৃষ্টি হচ্ছে তাদের মনে। আমি মনে করি এর প্রভাব আমাদের পার্টির উপরে অবশ্যই পড়বে। জনগণ ভাবতে পারে আমাদের ব্যর্থতার জন্যেই এসব হচ্ছে। অতএব আমাদের উচিত হবে সম্মিলিতভাবে সব ধরনের সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ রুখে দেওয়া। যে কোনও মূল্যে যে কোনও অন্যায় আমাদের রুখতেই হবে। যেমনটি রুখেছেন আমাদের এই বন্ধুটি। সমাজবিরোধীরা গতকাল রাতে এঁকে লক্ষ করে বোমা ছুড়েছিল, গুলিও চালিয়েছিল। তবু ইনি ভয় পেয়ে পালিয়ে যাননি। যার ফলে সমাজ বিরোধীরা পিছু হটতে বাধ্য হয়েছে। পার্টিকে ভালো না বাসলে এত বড় ঝুঁকি কেউ নিতে পারে ? আপনারাই বলুন ?

বিকাশ সেন খানিকক্ষণ থেমে রাজকীয় ভঙ্গিতে অন্যান্যদের দিকে তাকালেন। মুগ্ধ দৃষ্টিতে এবার সবাই দেখতে শুরু করেছে পার্থকে।

পার্থ কিন্তু হতবাক। গতকালের আকস্মিক ঘটনার উপরে পার্টির লেবেল এঁটে দিয়ে মানুষটি সত্যি-মিথ্যের বেসাতি করে যাচ্ছেন, যা মোটেই ভালো লাগছিল না তার। বরং একটু একটু করে রাগ জমছিল মনের মধ্যে। মানুষটি তার উপকার করেছেন ঠিকই, তা বলে ওঁর এসব কাজকে অন্ধভাবে সমর্থন করতে হবে ?

- আমি জানি আমাদের এই বন্ধুটি কোনওদিন সরাসরিভাবে পার্টি করেননি। কিন্তু পার্টিকে যে ভালোবাসেন সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। পার্টির জন্যে প্রয়োজনে ইনি যে নিজের জীবন পর্যন্ত দিয়ে দিতে পারেন, সে তো আপনারাও জেনেছেন। সত্যি কথা বলতে কী, এঁর এই মহৎ কাজ আমাদের কাছে এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে রইল। আমার ধারণা ভবিষ্যতে ইনি হতে পারেন অনেকেরই পথিকৃৎ। আমাদের দুর্ভাগ্য এঁকে আমরা এখনও সেভাবে পার্টির মধ্যে পাইনি। তবে আমরা আশা করব এবার থেকে পার্থবাবু সক্রিয়ভাবেই আমাদের পাশে এসে দাঁড়াবেন। এমন ছেলেদেরই তো দরকার পার্টিতে ! এঁদের দেখে উৎসাহিত হয়ে তাহলে নতুন প্রজন্মের আরও অনেকে যোগ দেবে আমাদের পার্টিতে। আমি চাই আগামী ফিফটিন্থ জুলাই ব্রিগেডে যে সম্মেলন আছে, সেই সম্মেলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের ভিতর দিয়েই আমাদের এই নতুন বন্ধুটির অভিষেক হোক পার্টিতে।

ক্রমশ উদ্বিগ্ন হচ্ছিল পার্থ। সবাই মিলে তার বিরুদ্ধে পরিকল্পনামাফিক চক্রান্ত শুরু করেছে যেন ।

এই বিকাশ সেন, উপস্থিত লোকগুলো, নন্তু... সবাই মিলে যেন একটা জাল দিয়ে আষ্টে-পিষ্টে জড়িয়ে ধরতে চাইছে, মুক্তি পাবার কোনও উপায় নেই। - বুকের মধ্যে কী একটা অদ্ভুত চাপে দম যেন বন্ধ হয়ে আসছিল পার্থর।

বিকাশ সেন বলে চলেছেন, নবমিতকে তো আপনারা সবাই চেনের। পার্থবাবু এই নবমিতেরই বন্ধু। সুতরাং আমরা বোধ হয় আশা করতেই পারি ওইদিন নবমিত ওর এই বন্ধুকে নিয়ে হাজির হবে ব্রিগেড সম্মেলনে। ...

আরও দু'চার কথা, আরও একটু আলোচনার পর বাকিরা একে একে বিদায় নিল। রয়ে গেল নন্তু আর পার্থ। বিকাশ সেনই ইশারায় তাদের বসতে বলেছেন।

অন্যরা চলে যাবার পর মিনিট তিনেকের মতো ভিতরে গিয়ে ফিরে এসে পার্থদের সামনেই বসলেন বিকাশ সেন।

- তারপর নন্তু ? কী খবর ওদিকে ?

- ভালো।

- এনি নিউজ ?

- পল্টু এসেছিল।

- তো ?

- বলে গেছে বিহার যাচ্ছে। এবার টানা ছ'মাস।

- গুড। বুঝিয়ে দিয়েছ তো সব ?

- ও ব্যাপারে কোনও চিন্তা-ই করবেন না আপনি। পল্টু কি বোকা ? এতদিন ধরে এ লাইনে আছে। ও কি বোঝে না এদিকে কিছু হলে ও নিজেই বাঁচবে না ?

- যাক গে যাক, ও নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে। এখন তোমার বন্ধুর সঙ্গে দু'টো কথা বলা যাক।

পার্থ বুঝতে পারল প্রসঙ্গ পাল্টালেন বিকাশ সেন। পল্টুর নাম সে শুনেছে। এ অঞ্চলের দাগি অপরাধী। খুন-জখম-তোলাবাজিতে তার বেশ নামডাক আছে। নন্তুর কথাবার্তায় পরিষ্কার যে পল্টু তার পরিচিত। নন্তু কি ওইসব আজেবাজে লোকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াচ্ছে আজকাল ? ব্যাপারটা ভালো লাগল না পার্থর। নন্তুকে সাবধান করতে হবে। সমাজবিরোধীদের সঙ্গে বিকাশ সেন সম্পর্ক রাখতে চান তো রাখুন ; কিন্তু নন্তু কেন রাখবে ?

- চা খাবে তো, চা ?

- না, না। তার দরকার নেই। বলল নন্তু।

- কেন ? দরকার নেই কেন ? তুমি না হয় নতুন নও, কিন্তু এ বাড়িতে পার্থবাবু তো নতুন। প্রথম এলেন আমার বাড়িতে। তাঁকে এক কাপ চা পর্যন্ত খাওয়াব না !

- ওকে 'আপনি' 'আপনি' কী বলছেন, 'তুমি'ই বলুন।

- হ্যাঁ, তাই তো ! 'আপনি' বলার দরকার কী। তড়িঘড়ি বলতেই হল পার্থকে।

বিকাশ সেন মৃদু হেসে আগে তিন কাপ চায়ের অর্ডার পাঠালেন ভিতর-বাড়িতে, তারপর বললেন, সত্যি কথা কী, আমিও তাই ভাবছিলাম। নন্তুর বন্ধু যখন, তার উপর আমার এলাকার ছেলে, 'তুমি' করে বলার অধিকার আমার নিশ্চয় আছে। আরে

ভাই, নিজের লোক বলে ভেবেছিলাম বলেই তো পুলিশের হাত থেকে ছাড়িয়ে আনলাম ! নইলে জানো তো পুলিশে ছুঁলে আঠারো ঘা।

পার্থ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের গলায় বলল, হ্যাঁ। আসলে আপনার কাছে শুধু আমি কেন, আমাদের বাড়ির সবাই কৃতজ্ঞ। সত্যি, আপনি না থাকলে কী যে হত !

খুশি হলেন বিকাশ সেন। বললেন, বোঝ ! অথচ সুকু শালা এখানে-সেখানে কী বলে বেড়ায় জানো ? বলে আমি নাকি কারও জন্যে কিছু করি না। গাধাটার মুখে ঝামা ঘষে দিয়েছি একেবারে। আরে বাবা, আমি তো জনগণেরই না কি, অ্যাঁ ?

নন্তু বলল, বিকাশদা, পুলিশের কাছ থেকে একে ছাড়িয়ে এনেছেন ঠিকই, সমস্যা কিন্তু তবু একটা থেকেই গেছে।

- কী সমস্যা ?

- যারা এসে মারতে চেয়েছিল, তারা কি সহজে ছাড়বে ? আজ না হোক কাল তারা আবার অ্যাটাক করতেই পারে, তখন ?

- তারা কারা ? সুকু দত্তের পোষা কুকুরগুলো তো ? শালা সুকু দত্তের বাপের ক্ষমতা আছে আমার পার্টির কোনও ছেলের গায়ে হাত দেবার ? রক্তগঙ্গা বইয়ে দেব না !

- পার্থ তো আমাদের পার্টির লোক না।

- আমাদের না ! তবে কাদের ?

- না, মানে, এ তো এখনও কোনও পার্টিই করে না।

- এবার থেকে করবে। ওই যে বললাম - ব্রিগেড।

পার্থ এবার মুখ খুললই, রাজনীতি-ফিতি আমার ভালো লাগে না, বিকাশদা।

বিকাশ সেন ভুরু কুঁচকে তাকালেন তার দিকে, চাকরি করো ?

- না।

- অনেক চেষ্টা করেছ নিশ্চয়। এবং যথারীতি চাকরি পাওনি। ঠিক বলছি তো ?

পার্থ মাথা নাড়াল।

- পাবেও না।

- মানে ?

- আরে বাবা, আজকাল চাকরি কি এমনি এমনি হয় ? টাকা ঢালতে হয় নতুবা এমন কিছু করতে হয়, যাতে চাকরি পাবার সম্ভাবনা থাকে। যেমন রাজনীতি। তা-ও যে সে পার্টি করলে হবে না। তাই বলছি বোকামি করছ কেন ? তুমি আমাদের পার্টিতে এসো। খেলা তো তোমায় ছাড়তে হচ্ছে না। দু'টো-একটা মিটিং-মিছিল অ্যাটেন করলেই যথেষ্ট। তখন দেখবে সুকু দত্ত কেন, নীরেন রায়ের চোদ্দ পুরুষেরও কারুরই সাহস হবে না তোমার গায়ে হাত দেয়। চাকরিও যাতে পাও, সে ব্যবস্থাও আমিই করে দেব। বলো, রাজি ?

পার্থ খানিক সময় থম মেরে বসে রইল। কী উত্তর দেবে সে ? কী উত্তর দেওয়া উচিত ?

তার উত্তরের অপেক্ষায় নন্তু তাকিয়ে আছে এদিকে। বিকাশ সেনও তাই।

খানিক বাদে সিদ্ধান্ত নিতে না পারা গলায় সে শুধু বলল, আজই কিছু বলতে পারছি না বিকাশদা। আমায় ক'দিন ভাববার সময় দিন।

বলা ছিল না আগে থেকে। তাই আজ প্র্যাকটিস শেষে মাখনদা এসে যখন শুধু বললেন, চল ; তখন পার্থকে জিজ্ঞাসা করতেই হল, কোথায় ?

মাখনদা বললেন, তোকে কখনও অতীনের কথা বলেছিলাম ?

- অতীন ? কই, নাহ্ !

- বলিনি ! ও হ্যাঁ, ওর কথা তোকে বলা হয়নি। আরে অতীন, মানে, অতীন চক্রবর্তী। আমাদের খাদ্যমন্ত্রী রে !

- খাদ্যমন্ত্রী ! তাঁর সঙ্গে আপনার পরিচয় আছে ?

- পরিচয় মানে ! ও তো আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল একসময়। বয়সে যদিও আমার থেকে ছোট। তবু বন্ধুত্বই হয়েছিল। একসঙ্গে রাজনীতি করতাম তো ! প্রথমবার যখন ইলেকশনে দাঁড়ায়, পৌরসভায় যদিও, তবু তখন খুব খেটেছিলাম ওর জন্যে। অনেকদিন অবশ্য দেখা সাক্ষাৎ নেই। বরানগর ছেড়েছি সেই কবে ! পৌরসভা থেকে শুরু করে আজ ও কোথায় আর আমি কোথায়। দেখা হলে চিনতে পারবে কি না কে জানে !

- আপনি এখন বরানগরে চললেন না কি ?

- আমি একা কোথায় ? তুইও তো যাচ্ছিস।

- আমি !

- না তো কে ? তা হলে আর কোথায় যেতে বলছি তোকে ?

- কী ব্যাপারটা কী ?

- আছে ব্যাপার একটা। গিয়ে দেখতে পাবি। তবে জেনে রাখ, তোর জন্যেই যাওয়া।

কিন্তু বরানগরে পৌঁছে দেখা পাওয়া গেল না মন্ত্রীমশাইয়ের। রাইটার্সে গেছেন। সেখান থেকে অন্য কোথাও যাবেন। ফিরতে রাত হয়ে যাবে। - গার্ডের কাছে পাওয়া গেল খবরটা। প্রথমে তো উটকো লোক ভেবে পাত্তাই দিতে চাইছিল না গার্ডটা। অনেক বলার পর যখন বোঝানো গেল মাখন চক্রবর্তী মন্ত্রীমশাইয়ের এককালের বন্ধু, তখন কিছুটা নরম হয়ে খবরটা ছাড়তে রাজি হল সে এবং ভরসাও দিল আগামীকাল সকালে, বিশেষ করে সাড়ে ছ'টা-সাতটার আগে এলে দেখা হতে পারে।

মাখনদা ওটুকু খবরেই খুশি।

অবশ্য পরের দিন সকালেও মন্ত্রীমশাইয়ের সঙ্গে দেখা করা গেল না।

গার্ড জানাল, মিনিট দশেক আগে স্যার বেরিয়ে গেছেন। আজও দেখা হবে না।

দু-দু'বার বিফল হয়েও মাখনদার উৎসাহে ঘাটতি পড়েনি। পার্থর হতাশ মুখের দিকে তাকিয়ে কিছুটা সান্ত্বনার ভঙ্গিতে তাই যেন বললে, ওরে হয়, হয়। এরকমই হয়। মন্ত্রী বলে কথা ! কখন কোথায় কাজ থাকে, কোন সময়ে বেরিয়ে যেতে হয়, তার কি ঠিক আছে ? আমাদের আরও আগে আসা উচিত ছিল।

দু'জনকেই ব্যর্থ ফিরে যেতে দেখে গার্ডের বোধ হয় দয়া জেগে থাকবে। সে পিছন থেকে ডাক দিয়ে ফিরাল আবার, এক কাজ করতে পারেন। একটা কাগজে আপনাদের নাম-ঠিকানা লিখে আমার কাছে দিয়ে যেতে পারেন। আমি স্যারের সাথে কথা বলে একটা ডেট নিয়ে রাখব না হয়। তারপর আপনারা একদিন এসে...।

মাখনদা বললেন, তার চেয়ে এক কাজ করলে হয় না ? অতীনের মোবাইল নাম্বারটা যদি দেন, তাহলে আমি নিজেই ফোন করে না হয় কথা বলে নেব।

- সেটা কী করে সম্ভব ? স্যারের মোবাইল নাম্বার যাকে-তাকে দেবার হুকুম নেই যে ! তার চেয়ে বরং আমি যা বললাম, তাই করুন না !

অগত্যা আর কী করা। একটা সাদা কাগজে নিজের নাম-ঠিকানা-ফোন নম্বর লিখে গার্ডের হাতে সেটা তুলে দিলেন মাখনদা।

তবে হাল ছাড়লেন না। পার্থকে টেনে নিয়ে চললেন পুরনো বন্ধু-বান্ধবদের খোঁজে।

যেতে যেতে স্মৃতিচারণে বিভোর, বরানগরে সে সময় অবশ্য ভাড়া থাকতাম আমরা। বাবার ছিল ট্রান্সফারেবল্ জব। অতএব থিতু হবার উপায় ছিল না কোথাও। বুঝতেই পারছিস, আজ এখানে তো তরশু সেখানে। তবু বরানগরে নয় নয় করেও দশটা বছর ছিলাম। বন্ধু-বান্ধবও নেহাত কম ছিল না। তবে দীর্ঘদিন যোগাযোগ না থাকলে যা হয়। অনেকে তো আবার কর্মসূত্রে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়েও পড়েছে। অতএব ক'জনকে খুঁজে পাব জানি না।

কয়েকজনকে পাওয়া গেল অবশ্য। কেউ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত, কেউ বা স্থানীয় স্কুলের শিক্ষক।

দেখ গেল বন্ধু-বান্ধবদের অনেকেই মাখন চক্রবর্তীর খবরাখবর কিছুটা রাখে।

অতীন চক্রবর্তির প্রসঙ্গ উঠতেই বীজেশ নামের এক ব্যবসায়ী বন্ধুর গলায় রীতিমতো উষ্মা, দুর, দুর। ও আর মানুষ আছে নাকি ! দ্বিতীয়বার এম.এল.এ হবার পর

থেকেই পাল্টাতে শুরু করেছিল। মন্ত্রী হয়ে এখন তো ধরাকে সরা জ্ঞান করে। স্বনামে-বেনামে দেশি-বিদেশি গাড়ি, ধন-সম্পত্তি ; এখানে এই বাড়ি দেখলে কী হবে, সল্ট লেকে পেল্লায় একখানা বাড়ি রয়েছে বউয়ের নামে। আরও কোথায় কোথায় যেন ফ্ল্যাট-ট্যাট রয়েছে ওর। তবু যদি খাই মেটে ! কী করে জানিস মাখন ? রিকশা স্ট্যান্ড, অটো স্ট্যান্ড - এসব জায়গা থেকে ইউনিয়নের নামে তোলা তোলে। তারপর তো পার্টির নামে কুপন ছেড়ে, এখান-ওখান থেকে ঝেড়ে-টেড়ে টাকা রোজগার তো আছেই। কী বলব তোকে, পাবলিক এখন খেপচুয়াস হয়ে আছে ওর ওপরে। এবারের ভোটে শুনছি পার্টি থেকে ওকে আর দাঁড় করাবে না। তবু যদি ও দাঁড়ায়, জেনে রাখিস নির্ঘাৎ হারবে।

না, বীজেশের কাছ থেকে তো নয়ই, আর কারও কাছেও অতীন চক্রবর্তীর মোবাইল নম্বর পাওয়া গেল না।

খোঁজ-খবর নিতে সকালের প্র্যাকটিস সেরে আসতেই হল আরেক দিন।

আগের গার্ডের জায়গায় অন্য একজন ডিউটি করছে। পার্থ গিয়ে সরাসরি জানতে চাইল, স্যার কি বাড়িতে আছেন ?

উত্তর এল, হ্যাঁ।

- আমরা একটু উনার সঙ্গে দেখা করতে চাই।

- অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে ?

- আমরা আগে দু'বার এসে ফিরে গেছি।

- তো ? ওরকম তো কতজনে ফেরে।

- না, মানে, আপনার জায়গায় আগে যিনি ডিউটিতে ছিলেন, তাঁর কাছে আমাদের নাম-ঠিকানা লিখে দিয়ে গেছিলাম। উনি বলেছিলেন পরে আসতে।

- ও তো নেই দেখতেই পাচ্ছেন।

- হ্যাঁ, সে তো ঠিক। কিন্তু এই নিয়ে তিনবার এলাম। ইনি মাখন চক্রবর্তী। মন্ত্রীর এক সময়কার বন্ধু।

- বন্ধু !

গার্ডটা এবার তাকাল মাখনদার দিকে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে যেন মেপে নিল মাখনদার ভার ও ধার। তারপর অবলীলায় বলল, স্যারের এরকম বন্ধু-ফন্ধু রাস্তাঘাটে অনেক আছে। ওসব ছুতো চলবে না। অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া কাউকেই ভেতরে ঢুকতে দিতে পারব না আমি।

- ইনি যে মন্ত্রীর বন্ধু বিশ্বাস হল না সেটা ? বিশ্বাস না হয় ভিতরে যান। গিয়ে স্যারকে নামটা বলে দেখুন।

- আরে মশাই ফুটুন তো এখান থেকে ! কেন ভ্যানর ভ্যানর করছেন ? বলেছি তো দেখা হবে না, ব্যস !

অপমানে, রাগে, মাখনদার চোখে-মুখে লালচে আভার মেঘ।

রাগ হল পার্থরও। কড়া ভাষায় কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল সে। কিন্তু তার আগেই মাখনদা খানিকটা জোর গলায় ডেকে উঠলেন, এই অতীন -- ।

মুখ ফিরিয়ে পার্থ দেখল বাড়ির মধ্যে খানিকটা ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা লালবাতি লাগানো একটা অ্যাম্বাসেডারে উঠতে গিয়েও থেমে গেছেন খাদ্যমন্ত্রী।

গার্ডকে পরোয়া না করে মাখনদা প্রায় ছুটেই পৌঁছে গেলেন তার কাছে।

পিছনে পিছনে চলল পার্থও।

- আমায় চিনতে পারছ অতীন ?

মন্ত্রীকে 'তুমি' সম্বোধন ! প্রথম ধাক্কাতেই খাদ্যমন্ত্রীর গম্ভীর মুখ আরও গম্ভীর।

- আরে আমি মাখন। মাখন চক্রবর্তী।

বিনা বাক্য ব্যয়ে খাদ্যমন্ত্রী এবার উঠে পড়লেন গাড়িতে। সশব্দে গেটটা আটকেও দিলেন।

কিন্তু কেমন যেন পাগলের মতো ভাব করছেন মাখনদা। নিজেকে চেনাবার জন্যে খানিকটা যেন মরিয়া।

- সেই যে, এই বরানগরে থাকতাম...। পৌরসভা ভোটে প্রথমবার তুমি দাঁড়ালে। জেতার পর তুমি, আমি, ত্রিদিব সেই যে দার্জিলিং...। মনে পড়ছে ? চিনতে পারছ এবার ?

- না চেনার কী আছে ?

- এই তো। জানতাম চিনবে ! কয়েক বছর না হয় এদিকে আসতে পারিনি। তা বলে ভুলে যাবার তো কথা না ! আমি আসতে চেয়েছি, জানো ? বহুবার মনে হয়েছে, যাই গিয়ে পুরনো বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা করে আসি। কিন্তু কী জানো, খেলাধুলো সামলে আবার আসা...

- কিছু বলবেন ?

মন্ত্রীর গলার স্বরে চমকে উঠলেন মাখনদা। আগে দু'জনের মধ্যে 'আপনি' বলার চল ছিল না। নিজে সেই সুবাদে 'তুমি' করে বললেও মন্ত্রীর মুখে 'আপনি' সম্ভাষণ যেন এ-কথা মনে করিয়ে দেয় - 'তুমি' নয়, এবার দু'জনের মধ্যে 'আপনি'র ব্যবধান।

মাখনদা ঢোক গিলে বললেন, না, মানে, একটা রিকোয়েস্ট নিয়ে এসেছিলাম তোমার কাছে। তাড়া না থাকে তো যদি আমার কথাটা শোনো...।

- বলুন কী বলতে চান।

- আমি না। আমার জন্যে আমি আসিনি। এই যে আমার সঙ্গে আসা এই ছেলেটা, এর জন্যেই...।

- বললাম তো বলুন !

- আসলে কথা হল কী, পেপারে দেখলাম ফুড কর্পোরেশানে এবার প্রচুর পরিমাণে লোক নেওয়া হবে, তাই ভাবলাম তোমার সঙ্গে দেখা করি। এ ছেলেটা খুব গরিব। বাবা ছোট একটা কারখানায় কাজ করে। অবিবাহিত একটা বোনও রয়েছে ঘরে। তার ওপর আবার মা-টা খুবই অসুস্থ। এই অবস্থায় একটা চাকরির খুব দরকার এর। তুমি জানো না, ছেলেটা খুব ব্রিলিয়ান্ট ফুটবলার। ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল।

- তা আমাকে কী করতে হবে ?

- কিছু করা মানে, তুমি যদি একটু ভরসা দাও...।

- ভরসা ! কীসের ভরসা ?

- তোমারই তো দপ্তর। তুমিই তো সব। তুমি চাইলে এ ছেলেটার একটা চাকরি হতে পারে।

- এটা গণতন্ত্রের যুগ মাখনদা। একনায়কতন্ত্রী শাসনতন্ত্র নয়। আমি চাইলেই সব কিছু করতে পারি না। সবটাতে একটা সিস্টেম আছে। পরিক্ষায় বসতে হবে, পাশও করতে হবে। তারপর তো চকরি ! সেসব না করেই চাকরি চাইতে আমার কাছে এসেছেন ?

- না, না। তা কেন ? পরীক্ষায় তো ও বসবেই। আশা করি পাশও করবে। কিন্তু কথা হল আজকাল ধরা-চরা না থাকলে তো পরীক্ষায় পাশ করেও চাকরি পাবার জো নেই। তাই সরাসরি তোমার কাছে এলাম।

- ছেলেটি আপনার কে হয় ?

- কেউ না। মানে আমার কোচিং-এ ও অভিযান ক্লাবে খেলে। ওকে নিয়ে আমার খুব আশা আছে অতীন। চাকরি একটা না পেলে ওকে খেলা-ই ছেড়ে দিতে হবে হয়তো।

- দেখুন মাখনদা, রাস্তায় দাঁড়িয়ে, আই মিন এভাবে আমি কারও সঙ্গে কথা বলি না। শুধু আপনি বলেই...। যাকগে, যা বলি শুনুন, আজকাল চাকরির যা বাজার, বোঝেন তো, একটা ছোটখাট চাকরির জন্যেই হাজার হাজার ছেলে-মেয়ে হাঁ করে বসে আছে। প্রথম সুযোগেই সবাই বাজিমাত করতে চায়। সুযোগ তো আর বার বার আসে না ! আপনি বরং ছুটির দিন দেখে একদিন আমার পি. এ.-র সঙ্গে দেখা করুন। সে-ই বলে দেবে আপনাকে কী করতে হবে। কেমন ? আজ চলি। আমার একটু তাড়া আছে।

অ্যাম্বাসাডারটা মাখনদা আর পার্থর মুখের উপরে ধোঁয়ার কামান দেগে দিয়ে বেরিয়ে গেল রাজকীয় ভঙ্গিমায়।

দু-দু'টো চেষ্টাই মাঠে মারা গেল পার্থর। চাকরি হল না। হবে না যে, এরকম একটা ধারণা অবশ্য আগে থেকেই করে রেখেছিল। বিড়ালের ভাগ্যে কখনও শিকে ছেড়ে ?

একবার সুখেনের পাল্লায় পড়ে ফুটপাতের এক জ্যোতিষিকে হাত দেখিয়েছিল সে। জ্যোতিষি বলেছিল তার হাতে নাকি চাকরিযোগ আছে। ধুর। সব মিথ্যে। সব। খাটে না। কিস্যু খাটে না।

টালিগঞ্জের সেই বিভূতিবাবুর অফিসে নতুন লোক নেওয়া দূরে থাক, কাউকে কাউকে ভি.আর.এস. নিতে চাপ দেওয়া চলছে।

আর ফুড কর্পোরেশনের চাকরি ? মাখনদা নিজে আর আসেননি। কিন্তু পার্থকে পাঠিয়েছিলেন অতীন চক্রবর্তীর পি.এ.-র কাছে। মন্ত্রীর জবানীতে সেই পি.এ. এক লাখ চেয়েছে। মাখন চক্রবর্তীর ক্যান্ডিডেট বলেই নাকি এক লাখ চাওয়া হয়েছে নতুবা দেড়-দু'লাখের কমে কোনওমতেই রাজি হতেন না মন্ত্রী। - এক লাখ দূরে থাক, একসঙ্গে হাজার কয়েক টাকাই বা কোথায় পাবে পার্থরা ? দু'টো সুযোগ হারিয়ে তাই এখন শেষ ভরসা সেই খেলা-ই।

কলকাতার খেলার মাঠগুলোতে এর মধ্যেই লিগ শুরু হয়ে গেছে। মেতে উঠেছে কলকাতা। ফুটবলপ্রেমীরা এ মাঠ থেকে ও মাঠে দৌড়ে দৌড়ে বেড়াচ্ছে। সব ক'টা খেলাতেই যে মাঠে দর্শকে দর্শকে ভরে যাচ্ছে, তা নয়। তবে বাস্তবিকই যারা ফুটবল পাগল, তাদের উপস্থিতি প্রায় সব মাঠেই। তার উপর প্রতি ক্লাবেরই কিছু কট্টর সমর্থক থাকে। নিজেদের ক্লাবের খেলা থাকলে মাঠে আসবার চেষ্টা করেই তারা। এমনই সব দর্শকদের উপস্থিতিতে যুবভারতী স্টেডিয়ামে এক উত্তেজনাকর ম্যাচে তুলনামূলক হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করেও শেষপর্যন্ত খেলা ড্র করল ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান।

অন্যদিকে মহামেডানের মাঠে মহামেডান ২-১ গোলে হারিয়ে দিল টালিগঞ্জ অগ্রগামীকে ; যদিও খেলল ভালো টালিগঞ্জ অগ্রগামীই।

ভালো খেলেও হেরে যাবার নজির অবশ্য কলকাতার মাঠে কম নয়। কলকাতার তিন

প্রধান ছাড়া অপেক্ষাকৃত ছোটখাট দলও মাঝে মাঝে খুব ভালো খেলে ফেলে। বড় দলগুলোকেও অনেক সময় দারুণভাবে রুখে দেয়। কখনও কখনও হারিয়ে দিতেও দেখা গেছে।

আসলে মনোবলই এইসব দলকে বড় দলগুলোর বিরুদ্ধে বেশিরভাগ সাফল্য এনে দেয়। মনোবলের সঙ্গে থাকে অবশ্য দৃঢ় সংকল্পও।

পার্থদের অভিযান ক্লাবের খেলোয়াড়দেরও দৃঢ় সংকল্প - লিগের খেলায় এবার তারা ভালো খেলবে। খেলবেই।

কিন্তু ফুটবল যে এগারোজনের খেলা, কিছুদিনের মধ্যেই তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়ে গেল অভিযান ক্লাব। প্রথম ম্যাচেই উয়াড়ীর কাছে হেরে গেল ১-০ গোলে। পার্থর কিছুই করার ছিল না। দু-দু'জনকে তার সঙ্গে আঠার মতো জুড়ে দিয়েছিল উয়াড়ীর কোচ শ্যামল দত্তচৌধুরি। মার্কাররা পার্থকে বল নিয়ে ছুটতেই দেয়নি। সে দাঁড়িয়ে যেতেই সুখেন ছাড়া গোটা দলই যেন দাঁড়িয়ে গেল। দ্বিতীয়ার্ধে খেলা শেষের বারো মিনিট আগে অভিযানের ডিফেন্স চিরে প্রায় বিনা বাধায় গোল দিয়ে গেল উয়াড়ী। আরও যে গোল হয়নি, সেটার নব্বই ভাগ কৃতিত্ব অভিযানের গোলকিপার জগন্নাথের প্রাপ্য।

তবে একটা লক্ষ্য নিয়ে নেমে হেরে যাওয়া একটা বড় ধাক্কা।

আজ সেই ধাক্কারই জের চলছিল অভিযান ক্লাবের শিবিরে।

গতকাল ম্যাচ হেরে ক্লাবের সবারই মাথা হেঁট হয়ে গেছে। খেলোয়াড়দের কারও মুখে কোনও রা নেই। একটু আগে ক্লাব সেক্রেটারি মানুদা এসে গরম গরম কিছু কথা শুনিয়ে গেছেন।

অন্যান্য কর্তারা আসছেন এক এক করে। তাঁদেরও চোখে-মুখে স্পষ্ট বিরক্তি।

আড়ালে-আবডালে মাখনদার সমালোচনা করছে কেউ কেউ। মাখনদা নাকি ভুল ছকে খেলিয়েছেন।

পার্থর অবশ্য সেরকমটা একবারও মনে হয়নি। বরং মনে হয়েছে মাখনদার ছক ঠিকই ছিল। সে নিজে যদি ঠিকঠাক খেলতে পারত কিংবা ইলিয়াসকে যদি পাশে পেত তাহলে অন্যরকম হয়ে জেত ম্যাচের ফলাফল।

ইলিয়াসের জায়গায় প্রথমে প্রদীপ এবং তারপরে আলি রাজাকে নামানো হয়েছিল। কিন্তু কেউই কিছু করতে পারেনি। সত্যেনও ব্যর্থ। ডিফেন্ডাররা স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে ছিল যেন। খেটে খেলার গা ছিল না কারুর। তবে লড়ে গেছে একা সুখেন। ওকে এবার প্রথম থেকেই নামিয়েছিলেন মাখনদা। নিজেদের ক্লাবের জন্যে মরণপণ করে কীভাবে খেলতে হয়, তা দেখিয়ে দিয়েছে সুখেন। হয়তো পুরো ম্যাচে তাকে খেলানোর মর্যাদা রাখতে চেয়েছিল সে। কিন্তু চাইলেই কি সব সম্ভব ? ভালো খেলেও ম্যাচ ফেরানোর মতো ক্ষমতা কোথায় তার ? কারণটা সেই একই, ফুটবল এগারোজনের খেলা, মাত্র একজনের কখনই নয়।

ম্যাচে হেরে যেতেই দু'হাতে মুখ ঢেকে হু হু করে কেঁদে ফেলেছিল সুখেন। এসে যে সান্ত্বনা দেবে, তেমন কোনও ভাষা জোগায়নি কারুর মুখেই।

আজ অনেক আগে ক্লাবে এসেছেন মাখনদা। শুকনো মুখে ক্লাব কর্তাদের সঙ্গে ঘন ঘন মিটিং করছে। এবং মাঝে মাঝে বাইরে এসে পায়চারি করছেন অস্থিরভাবে। গতকাল ম্যাচের পর থেকে কারও সঙ্গে ভালো করে কথা পর্যন্ত বলছেন না। আর তাতেই পার্থদের মনে হচ্ছিল, পৃথিবী দ্বিধা হয়ে যাক। আসলে লজ্জা, অনুশোচনা সবাইকে মুষড়ে দিচ্ছিল আরও।

একটা সময় মাখনদা এসে বসলেন ওদেরই কাছাকাছি একটা জায়গায়।

পার্থ দেখল খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে মাখনদাকে। যেন একটা আচমকা ঝড়ে একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গেছেন মানুষটি। মানুদা কি ওঁকে কিছু বলেছেন ? খারাপ কিছু ?

সে ডাকল, মাখনদা। শব্দটা যেন এ দেওয়াল থেকে ও দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে ঘুরে বেড়াল। উত্তর এল না কোনও। শুধু মুখটা ঘুরল একটু।

একেবারে যেন থমকে গেল পার্থ।

মাখনদার চোখে জল !

- তোরা সবাই এসে গেছিস ? আজ আমার আসতে একটু দেরি হয়ে গেল রে !

কথা বলে চোখের জল গোপন করতে চাইলেন মাখনদা। কিন্তু ততক্ষণে সবার কাছে ধরা পড়ে গেছেন।

একটা অদম্য আবেগ সবাইকে ব্যথিত করে তুলল সঙ্গে সঙ্গে। মাখনদা কাঁদছেন ? আহ্, এই দৃশ্য দেখার চেয়ে মরে যাওয়াও যে অনেক ভালো ছিল !

- আমাদের ভুল হয়ে গেছে মাখনদা। আর কোনওদিন এরকম ভুল হবে না। আর কোনও ভাষা খুঁজে না পেয়ে ওইটুকু বলল সত্যেন।

- ভুল ! না, না। তোদের ভুল কোথায় ? ভুল তো আমারই। আমার ট্যাকটিসেই ভুল ছিল। নইলে প্রথম দিকে অত ভালোভাবে শুরু করেও উয়াড়ীর কাছে ওভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হারতিস না তোরা। এই জন্যেই কি আমি অত কষ্ট করে দু'বেলা প্র্যাকটিস করিয়েছিলাম ? এত করেও যখন তোদের গড়ে তুলতে পারিনি, তখন ব্যর্থতার দায় তো একা আমাকে নিতেই হবে।

কারুর মুখে কোনও কথা নেই। মাথাও নীচুর দিকে।

- যাক, যা হবার হয়ে গেছে। পরের ম্যাচে তোরা পাচ্ছিস সবুজ সংঘকে। সে ম্যাচ জিতে আমার অক্ষমতাকে যদি ঢেকে দিতে পারিস, দ্যাখ চেষ্টা করে।

কিন্তু ফুটবল শুধুমাত্র এগারোজনের খেলা-ই নয়। কিছুটা পরিমাণে ভাগ্যের খেলাও। সেরকমই দৃষ্টান্ত দেখা গেল পরের ম্যাচে।

জিততে হবে। জিততেই হবে - এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে মাঠে নেমেছিল সবাই। প্রথম ও দ্বিতীয়ার্ধে সারা মাঠ দাপিয়ে বেড়াল অভিযান ক্লাবের ফুটবলাররা। তাদের ক্রমাগত আক্রমণে সবুজ সংঘের ডিফেন্স বার বার পরাস্ত হয়ে গেল। তবু জয় পেল না

অভিযান। চার চারটে অবধারিত গোল বাঁচিয়ে দিল সবুজ সংঘের গোলকিপার। ড্র হয়ে গেল ম্যাচটা। উভয়পক্ষেই ফলাফল ০-০ ।

পরদিন ক্লাবে গিয়ে পার্থ দেখল, সত্যেন, দেবাশিস, আলি রাজা - এরা কেউ আসেনি। সুখেন-আদিত্যরা মাঠের মধ্যে অলসভাবে বসে আছে। কী একটা নিয়ে যেন আলোচনা করছে।

সুখেন তাকে দেখতে পেয়ে হাত উঁচিয়ে ডাকল, এই পার্থ, এদিকে।

কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই হাত ধরে টানল সুখেন, বোস। কথা আছে।

পার্থ বসল ওর পাশেই।

- মাখনদার খবরটা জানিস তো ?

- মাখনদা ! কোন খবর ?

- তুই শুনিসনি কিছু ?

- না !

- মাখনদা কোচিং ছেড়ে দিয়েছেন।

- কী যা তা বলছিস !

- হ্যাঁ রে, সত্যি। মাখনদা ক্লাব ছেড়ে চলে গেছেন। কাল থেকে আমাদের নতুন কোচ হচ্ছেন কমলদা। কমল সাহা।

আদিত্য বলল, লিগের এই পিক টাইমে মাখনদা যে এভাবে আমাদের জলে ভাসিয়ে দিয়ে কেটে পড়বেন কেউ ভাবতে পেরেছিল ?

কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না পার্থ। মাখনদা এখন করলেন ? মাখনদা !

- তোরা ইয়ার্কি মারছিস না তো ?

- বিশ্বাস হচ্ছে না ? যা, মানুদার কাছে যা।

গিয়ে জিজ্ঞেস করে আয়। তাছাড়া প্র্যাকটিসের টাইম হয়ে গেছে অথচ মাখনদা এখনও আসেননি দেখে বুঝতে পারছিস না ? বলল আদিত্য।

কথাটায় যুক্তি আছে। যে মানুষটি তাদের প্র্যাকটিসে আসার ব্যাপারে সময় নিয়ে অত কড়াকড়ি করতেন, বিনা কারণে তিনি এখনও পর্যন্ত মাঠে এসে পৌঁছাননি, এটা মানা যায় না। কিন্তু লিগের খেলার এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তাদের অকুলে ভাসিয়ে ক্লাব ছাড়লেন মাখনদা, এটাও যে তাঁর চরিত্রের সঙ্গে মেলে না !

কেন ক্লাব ছাড়লেন তিনি ?

বড় কোনও ক্লাবের অফার পেয়েছিলেন ?

না কি মানুদা কিংবা সুপ্রকাশবাবুদের চাপে...

পার্থ বলল, তোরা যা বলছিস তা যদি সত্যি হয় তবে আমি বলব, মাখনদা সম্ভবত নিজে থেকে ক্লাব ছাড়েননি। তাঁকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। খোঁজ নিয়ে দ্যাখ মানুদারাই হয়তো পেছন থেকে ছুরি মেরেছে।

কথাটা শুনেই লাফিয়ে উঠল সুখেন, তুই ঠিক জানিস মানুদাই এ কাজ করিয়েছে ? তা হলে তো মানু শালাকে একবার দেখতে হয় !

পার্থ জানে সুখেনের এটা ফাঁকা আওয়াজ। ও নিজে কী করতে পারে আর ? হ্যাঁ,

মানুদাকে গিয়ে চড়-চাপড় মারতে পারে কিংবা গালাগালিও দিতে পারে। কিন্তু সে সাহস কোথায় ওর ? মানুদার কুপ্রভাবে যে তাহলে ওর ফুটবল কেরিয়ারই শেষ হয়ে যাবে। তবু মাখনদার পক্ষ নিয়েছে বলে সুখেনের আগ্রাসী ভঙ্গিকে ভালো লাগল পার্থর।

সে বলল, কে করিয়েছে তা তো আর সিওরভাবে বলতে পারব না। আবার আদৌ কারুর ভূমিকা আছে কি না তা-ও জানি না। এটা স্রেফ আমার একটা অনুমান। সত্য যে কী ঘটেছে, সেটা তো একমাত্র বলতে পারেন মাখনদাই। তা জানতে হলে তাঁর বাড়িতে যেতে হবে।

- যাবি ? যাবি একবার ? চল যাই। ছটফটিয়ে উঠল সুখেন। আবার বলল, বাড়ি চিনিস তো না কি ?

- চিনি।

- ও হ্যাঁ, তাই তো। তুই তো গেছিস কয়েকবার, না ? আমি একবারও যাইনি, জানিস ? চল, কথা বলেও আসা যাবে আবার বাড়িটাও দেখে আসা হবে।

- কখন যেতে চাস, বল ?

- গেলে কখন আর, এখনই যাব। আজ তো আর প্র্যাকটিস হবে না !

- কে কে যাবে ?

- কে কে যাবে আর ? তুই আর আমিই শুধু।

সুখেন উঠে দাঁড়াল। পার্থও।

আদিত্য না উঠেই বলল, কেন গুরু, আমরা যেতে পারি না ? বলে মলয়ের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল।

সেটা দেখতে পেয়ে ক্ষেপে গেল সুখেন, ফোট। তোরা তো শালা মনু হারামির চামচা। তোরা যাবি মাখনদার বাড়িতে !

- এই, গালাগালি দিবি না। ভালো হবে না বলছি !

- যা বে যা। তুই শালা খেটে খেলিসনি কেন রে ? মনু শালা তোকে ঘুষ দিয়েছিল নিশ্চয়।

সুখেন তার নিজের পায়েই কুড়ুল মারছে। মানুদার কানে কথাগুলো আদিত্য তুলবেই। তখন অভিযান ক্লাবে টিকে থাকা-ই কষ্টকর হবে সুখেনের পক্ষে। ও কি বুঝতে পারছে না সেটা ?

বাড়াবাড়ি কিছু একটা ঘটে যাবার আগে পার্থ তাই থামাতে চাইল সুখেনকে, আহ্, সুখেন ! চল তো, চল।

সুখেন তবু থামতে নারাজ, ছাড়, ছেড়ে দে। ও শালা আমাকে চেনে না। শালারা মিরজাফর। ইচ্ছে করে খারাপ খেলে মাখনদাকে ফাঁসিয়ে দিয়ে এখন শালা অ্যাক্ট হচ্ছে, অ্যাক্ট ? খেলতে পারিস না তো খেলতে আসিস কেন তোরা ? লজ্জা থাকে তো মাঠেই নামবি না আর।

সুখেনকে ছাড়েনি পার্থ। একপ্রকার টানতে টানতে নিয়ে চলেছিল। যেতে যেতেই আদিত্যকে বলতে শুনল, যা, যা। কার কত মুরোদ জানা আছে। পুরো ম্যাচ যে কখনও খেলতে পায় না, তার আবার বড় বড় কথা !

- আমি পুরো ম্যাচ খেলতে পাই না পাই তাতে তোর কী রে শালা ? যেটুকু সময় মাঠে থাকি, তোর চেয়ে তো ভালো খেলি ! শালা বাঞ্চোৎ, আবার সাফাই গাইছে, সাফাই ! বক বক করতে করতে চলল সুখেন।

ওদিকের তরফেও মুখে বোমা ফাটছে। কিন্তু পার্থরা ক্রমশ রাস্তার দিকে এগিয়ে যাওয়ায় কথাগুলো শুনতে পাচ্ছে না ভালোভাবে।

ভাগ্যিস শুনতে পাচ্ছে না।

মাখনদাকে বাড়িতেই পাওয়া গেল। ওদের দু'জনকে দেখে একটু অবাকই হলেন, কী ব্যাপার ? হঠাৎ আমার কাছে ?

- আপনি মাঠে নেই। প্র্যাকটিসও হল না আজ। তাই ভাবলাম একবার ঘুরে যাই এখান থেকে। কী বলা উচিত ঠিকঠাক ভেবে না পেয়ে বলল সুখেন।

পার্থ অবশ্য যে কারণে আসা, সেটা বলার জন্যে মুখ খুলল, আসলে মাখনদা...

মাখনদা হাসলেন।

- আমি জানি রে, কী বলবি। সত্যিই আমি অভিযান ক্লাব ছেড়ে দিয়েছি কি না তাই জানতে চাস তো ? হ্যাঁ, যা শুনেছিস সব সত্যি।

- কিন্তু কেন ? পার্থর খুব কান্না পাচ্ছিল, স্বীকার করছি আমরা ভালো খেলতে পারিনি। কিন্তু সব দিন তো সমান যায় না ! লিগের অন্য খেলায় আরেকবার চান্স দিয়ে দেখতে পারতেন। ভালো খেললেও তো খেলতে পারতাম ! তা না করে আমাদের ছেড়ে দিয়ে শাস্তি দিলেন ?

- কী ? আমি তোদের শাস্তি দিয়েছি ? আমি ? ওরা তাই প্রচার করছে বুঝি ? মাখনদা

মাথা নেড়ে হাসলেন, নাহ্, মাথা-টাথা দেখছি গেছে ওদের ! বলে আবার হাসতে লাগলেন।

- আপনি হাসছেন ?

- না হেসে কী করি ? সত্যি সত্যিই যে হাসিটা পাচ্ছে পার্থ ! আমার বিরুদ্ধে ওরা আর কত মিথ্যে অভিযোগ আনবে ? এই নিয়ে তো পাঁচটা হল।

- অভিযোগ ?

- হ্যাঁ।

- কীসের ?

- কত কিছুর -- ! যেমন ধর, ফুটবলারদের দু'বেলা প্র্যাকটিস করিয়ে বেশি করে খাটানোর অভিযোগ, বার বার ভুল ছকে নাকি খেলিয়েছি তোদের, সেই অভিযোগ। আরও শুনবি ? সবুজ সংঘের কাছ থেকে আমি নাকি ঘুষ খেয়েছি, ঘুষ !

- সে কি ! এ অভিযোগ উঠেছে ?

- শুধু এটা কেন, এ বছরে ছেলেদের বুট আর জার্সি কেনার টাকার একটা বড় অংশ নাকি আমার পকেটেই গেছে। অর্থাৎ কিনা আমি চোর - ওরাই বলেছে। তোরা বল, এত অপমানের পরেও কি মুখ বুজে ওখানে পড়ে থাকা উচিত ছিল আমার ?

- আপনি প্রতিবাদ করলেন না কেন ?

- করেছিলাম। প্রতিবাদ ঠিকই করেছিলাম আমি। কিন্তু আমার কথা শুনবে কে ? আমি তো চোর। টাকা চুরি করেছি। ঘুষ খেয়েছি --। জোর করে হাসতে গিয়েও কেঁদে ফেললেন মাখনদা।

বেদনার্ত পার্থ নির্বাক, অধোমুখ।

ফুঁসে উঠল কেবল সুখেন, কোন শালা আপনাকে চোর বলেছে তার নামটা বলুন তো একবার, নামটা বলুন। মনু হারামি কি ? নাকি সুপ্রকাশ পাঁঠা ? মুখে তার নামটা বলুন একবার। বডি ফেলে দেব শালার।

নিজেকে সামলে নিয়ে সুখেনকে দেখলেন মাখনদা। এই ছেলেটিকে এক সময় তিনি খানিকটা অবহেলা করেছেন। পুরো ম্যাচে খেলাননি কোনওদিন। কিন্তু উয়াড়ীর সঙ্গে খেলার দিনে কী ভেবে প্রথম থেকেই নামিয়েছিলেন। সেদিন জীবনপণ করে যে খেলা ও খেলেছে, তার তুলনা মেলা ভার। তারপর থেকে ছেলেটি যে তার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছে, এই প্রথম তা বুঝতে পারলেন তিনি। অতএব সাবধান হয়ে গেলেন। এখন, বিশেষ করে এই মুহূর্তে কারও নাম প্রকাশ করার অর্থ হল ছেলেটিকে উস্কে দেওয়া। বদরাগি এই ছেলেটি কখন কী করে বসে তার ঠিক আছে ! তাতে আর কিছু হোক না হোক, খেলার জগতে বড় রকমের ক্ষতি হয়ে যাবে ওরই।

মৃদুভাবে হাসবার চেষ্টা করে তাই তিনি বললেন, বিশেষ করে কার নাম বলি বল তো ? একজনে তো ওকথা বলেনি। বলেছে অনেকেই। আর বাঁকা কথাটা সোজাসুজি বলে কেউ ? তুই শান্ত হ তো ! মাথা গরম করে কোনও কাজের সুরাহা হয় না।

- কী বলছেন, মাথা গরম হবে না ? আপনাকে ওরা এভাবে অপমান করল, তবু মুখ বুজে থাকতে বলছেন ?

- কী হবে মুখ খুলে ?

- আপনাকে আবার ফিরিয়ে নিতে বাধ্য করব আমরা।

- ফিরিয়ে নিতে ! নাহ্, তোরা দেখি এখনও সেই ছেলেমানুষই রয়ে গেলি। বন্দুক থেকে ছিটকে যাওয়া গুলি কি আর কখনও বন্দুকে ফিরে আসে ? যা হবার হয়ে গেছে। এ নিয়ে তোদের আর মাথা ঘামাতে হবে না। আমি এখন ভালোই আছি রে। মুক্তি পেয়ে ভালোই লাগছে। দায়িত্বটা বড্ড বেশি পরিমাণে নিজের ঘাড়ে নিয়েছিলাম

তো ! মানসবাবু-সুপ্রকাশবাবুদের কাছে ধরে নিতে পারিস এই মুক্তির জন্যে আমি কৃতজ্ঞই থাকব আজীবন। তোদের অবশ্য একটু অসুবিধে হবে। তবে সে দু'চার দিন। সুপ্রকাশবাবুর ভাই কমল তো তোদের কোচ হয়ে আসছেই।

- কোথায় আপনি আর কোথায় কমলদা ! পার্থ বলল কথাটা। না বলে পারল না। তরুণ সংঘে খেলার সময় কমলদাকে কিছুদিন কোচ হিসাবে পেয়েছিল সে। তখন থেকেই জানে তাঁকে।

কিন্তু মাখনদা বললেন, কেন, কমল আমার চেয়ে কম কী সে ? ফরেন থেকে তো ঘুরে এসেছে। আর যা-ই করি, আমি তো আর ফরেনে যেতে পারিনি !

- ফরেনে গেলেই হল ? অভিজ্ঞতার একটা দাম নেই ? আপনার অভিজ্ঞতা তো কমলদার চেয়ে অনেক বেশি - যে কেউ বলবে সে কথা।

মাখনদা হঠাৎ রেগে গেলেন।

- না, কেউ বলবে না। সবাই এখন কমলদের মতো ফরেন-ঘোরা কোচ চায়। সবাই।

- সবাই বলবেন না মাখনদা। আমরা অন্তত কমলদাকে চাই না।

- চাসনে না ? তা হলে বল কেন তোরা সেদিন জিততে পারলি না ? উয়াড়ী এমন কিছু ভালো খেলেনি সেদিন। তবু তোরা কেন গোল খেয়ে গেলি বল দেখি ? ভেবেছিস আমি কিছু বুঝিনি, না ? - সুপ্রকাশবাবু তাঁর ভাইকে ক্লাবে নিয়ে আসার জন্যে অনেকদিন থেকে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করেছেন আর তাঁর সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন মানসবাবু। তোরা অস্বীকার করতে পারিস আমার বিরুদ্ধে ওঁরা তোদের কান ভাঙাননি ? আমি জানি, ওঁরা তোদের বুঝিয়েছিলেন কমলকে দিয়ে কোচিং করালে তোদের খেলার উন্নতি হবে। বল, এসব মিথ্যে কথা ?

পার্থ কাতর স্বরে বলল, বিশ্বাস করুন মাখনদা। আমি এসবের কিছুই জানি না। অমাকে অন্তত কেউ কিছু বলেনি।

সুখেন বলল, আমি তখনই বুঝেছিলাম ওই শালাদের কাজ। আপনি একবার মুখ ফুটে বলুন শুধু। আমার এমন অনেক বন্ধু-বান্ধব আছে, যাদের বললে ওদের সব ক'টাকে একদিন রাস্তায় ধরে টাইট করে দিয়ে আসবে। বড্ড বাড় বেড়েছে ওরা। চুপ করে থাকলে আরও মাথায় চড়বে।

সুখেন আশা করেছিল কিছু একটা বলবেন মাখনদা। তাকে হুকুম দেবেন, যা। তাই কর গিয়ে। বাড়টা ভেঙে দিয়ে আয়। কিন্তু তেমনটা মাখনদা করলেন না। খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর খুব উদাসীন এবং শান্ত গলায় শুধু বললেন, তোরা এখন যা। আমায় একটু একা থাকতে দে।

ইদানীং একটা অফ ডে চালু হয়েছে পার্থদের ক্লাবে। কমলদার কীর্তি। ওরকম দিনে প্র্যাকটিস বন্ধ। আজ সেরকমই একটা দিন।

বাড়িতে না থেকে থেকে এমনই অভ্যাস হয়ে গেছে যে, সকালে আর ঘরে বসে থাকতে না পেরে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেবার জন্যে বেরিয়ে পড়েছিল পার্থ। ভাসাদার চায়ের দোকানে তেমন কাউকে না পেয়ে অর্জুনদের হস্টেলে গেছিল সে। দুপুর একটার দিকে বাড়ি ফিরে দেখল কেউ নেই ঘরে। না মা, না শান্তা। বাবা অফিসে। পিয়ালের স্কুলে থাকার কথা এই সময়টায়। কেউ ঘরে না থাকার মানে দরজায় তালা আঁটা।

কী ব্যাপার ? কোথায় গেল মা আর শান্তা ? আজ তো মাকে ডাক্তারখানায় নিয়ে যাবার কথা নয় ! প্রথমটায় একটু রাগ হল শান্তার উপরে। খিদেয় পেট জ্বলছে। এই অবস্থায় দরজায় তালা বন্ধ দেখলে কার না রাগ হয় ? কিন্তু যখন সে ভেবে দেখল, শান্তা কলেজে গেছে ধরে নেওয়া গেলেও মায়ের বাড়িতে না থাকার কারণ তার শরীর-অসুস্থতাও হতে পারে, তখন দুরু দুরু শুরু হয়ে গেল বুকের মধ্যে।

রমলা বউদিদের ঘরেও তালা দেওয়া - দেখতে পেল পার্থ। একটু অবাকও হল। এ বাড়ির ভিতরকার একটা লোকও কি নেই, যাকে জিজ্ঞাসা করে কিছু জানা যায় !

রমলা বউদিদের ঘরের সামনে থেকে ফিরে আসতে গিয়ে সে দেখল উল্টো দিকের বাড়ির জানালায় তেলেগুভাষি সেই বউটা, যে মাত্র মাস দুই আগে ও বাড়িতে এসেছে ; যাকে নিয়ে মা ও ছেলের মধ্যে মাঝে-মধ্যেই ঝগড়া হয়। এর আগে মোটে বার চারেক বউটাকে দেখেছে পার্থ। যথেষ্টই সুন্দরী। অমন একটা বউকে নিয়ে মা-ছেলের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটির কারণ কী আজও ভেবে উঠতে পারেনি সে।

বউটা তাকেই ডাকল, শুনুন।

পার্থ অবাক হয়ে তাকাল তার দিকে। একেবারে জড়তাহীন বাংলা উচ্চারণ। বাংলা জানে বউটা ? এত ভালোভাবে !

চোখাচোখি হতেই বউটা আবার বলল, আপনাকেই ডাকছি। বাড়ির লোকদের খুঁজছেন তো ?

- হ্যাঁ। কাউকেই তো দেখছি না এদিকে !

- দেখবেন কী করে ? সবাই তো হসপিটালে।

- হসপিটাল !

- হ্যাঁ। আপনার মাকে নিয়েই তো গেল।

মা হাসপাতালে ! মা ? মাথার ভিতরে যেন ঘুরে এল পার্থর। থর থর করে কেঁপে উঠল শরীরটাও। বাকও রুদ্ধ হয়ে এল যেন।

পরিস্থিতি অনুমান করে বউটা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, না, না। সিরিয়াস কিছু নয়। আসলে মাথায় এমন পেইন উঠেছিল যে...।

- কোন হসপিটালে ?

- নীলরতন।

পার্থ আর দাঁড়াল না সেখানটায়। প্রায় দৌড়ে রাস্তায় চলে এল সে। বউটা যতই বলুক সিরিয়াস কিছু নয়, তার মন তা মানতে চাইল না। সিরিয়াস কিছু একটা না হলে হসপিটালে নিয়ে গেল কেন ? তা-ও সবাই মিলে !

হাসপাতালে এসে খানিকটা সমস্যায় পড়তে হল। মাকে ভর্তি করা হয়েছে কি না সে তো জানে না। হাসপাতালের এদিকে-ওদিকে খোঁজাখুঁজি করেও কাউকে পাওয়া গেল না। সুতরাং দৌড়তে হল সেই ইমারজেন্সিতেই।

ওখানেই পার্থ পেয়ে গেল রমলা বউদিকে।

- মা কোথায় বউদি ? মা ?

- ও, তুনি এসে গেছ ? আমরা তো ভাবছিলাম... । এই তো, মাসিমাকে নিয়ে গেল এই মাত্তর ।

- মা ভালো আছে তো ? কিছু হয়নি তো মার ? সত্যি করে বলুন বৌদি ।

- এই দ্যাখো, কী আবার হবে ? তেমন কিছু তো হয়নি । শুধু ওই মাথার যন্ত্রণাটা-ই... ।

- কোথায় ? কোন দিকে নিয়ে গেছে মাকে ?

- ওপরে । ঠিক কোন ওয়ার্ডে এখনও জানি নে । আমি তো তোমাদের জন্যেই এখানে দাঁড়িয়ে আছি ।

- কে আছে মার সঙ্গে ?

- তোমার বোন আর কোয়েল ।

পার্থ দৌড়াল আবার । সঙ্গে রমলা বউদি । কোন ওয়ার্ডে নিয়ে গেছে জানে না তারা । টেনশনের মধ্যে ইমারজেন্সিতে খোঁজ নিতেও ভুলে গেল । অতএব এ ওয়ার্ড থেকে ও ওয়ার্ডে অনর্থক ছুটোছুটি ।

শান্তা বা কোয়েল - কাউকেই খুঁজে না পেয়ে আবার সেই ইমারজেন্সিতে ফিরতে হল তাদের । ফিরেই দেখতে পেয়ে গেল দু'জনকে ।

সে কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই শান্তা এগিয়ে এসে বলল, চিন্তার কিছু নেই । ভর্তি হয়ে গেছে ।

- কেমন আছে এখন ?

- ইঞ্জেকশন দেবার পর এখন একটু ভালো। আগে যা যন্ত্রণা হচ্ছিল না !

- ডাক্তার কী বলছে ? যন্ত্রণাটা কীসের ?

- সি. টি স্ক্যান করিয়েছে। ডাঃ সেন যা বলেছিলেন তাই। ব্রেন টিউমার।

ব্রেন টিউমার ! স্তব্ধ হয়ে গেল পার্থ। ডাঃ সেনকে এর আগে যখন দেখানো হয়েছিল, তখন তিনি অবশ্য বলেছিলেন ব্রেন টিউমারের কথা। কিন্তু বিশ্বাস করতে পারেনি সে। তবু মনের মধ্যে আশঙ্কা একটা ছিলই। সেই আশঙ্কাই কিনা সত্যি হল !

পার্থর থমকে যাওয়া ভাবটা চোখ এড়াল না কোয়েলের, টেনশান কোরো না। ডাক্তার বলেছে ভয়ের কিছু নেই। অপারেশান করালে ঠিক হয়ে যাবে।

- অপারেশান করাতে হবে !

- তা ছাড়া উপায় কী ? এসব রোগ তো আর ওষুধে সারে না !

- কোথায় হবে অপারেশান ? এই হাসপাতালে না নার্সিংহোমে ?

- নার্সিংহোমে নিলে তো অনেক খরচ। কমে-সমে এখানেই হতে পারে। তবে টাকা লাগবেই।

- কত লাগবে কিছু বলেছে ?

- হ্যাঁ, বলেছে।

- কত ?

- তা ধরো ওষুধ, অপারেশান - এসব মিলিয়ে কমপক্ষে কুড়ি-পঁচিশ হাজার।

- পঁচিশ হাজার !

- তাই তো বলল। তবে ডাক্তারকে আগেই দিতে হবে দশ হাজার। তা হলে অপারেশানের তারিখ এগিয়ে পড়বে।

শান্তার উদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকাতে গিয়ে চোখে চোখ পড়ল দু'জনের।

- টাকাটা চেয়েছে কে ? ডাক্তার ? না কি অন্য কেউ ?

- ডাক্তারই বোধহয়। তবে যে ডাক্তার মাকে দেখছিল, সে না। অন্য একজন। বলল শান্তা।

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদের ভঙ্গিতে কোয়েল বলে উঠল, না, না। ডাক্তার কোথায় ? লোকটা তো ডাক্তারের সাথে সাথে ঘুরছিল। ডাক্তার না। অন্য লোক।

- অন্য লোক মানে ? দালাল-টালাল ?

- আমার তো তাই মনে হল।

মাথা গরম হয়ে উঠল পার্থর। হাসপাতালে ইদানীং সরকারি নির্দেশেই চিকিৎসা বাবদ কিছু খরচ দিতে হয়। কিন্তু এত টাকা দেবার কথা কখনও শোনেনি সে। যদি ধরে নেওয়া যায়, হ্যাঁ, ব্রেন টিউমার অপারেশানে এত টাকা দিতেই হয় এখন, সে টাকা জমা নিলে অফিসই নেবে। ডাক্তারকে কেন সরাসরি টাকা দিতে হবে ? তা-ও একবারে অগ্রিম দশ হাজার ! সব সরকারি হাসপাতালেই একশ্রেণীর দালাল চক্র সদা সক্রিয় তা অবশ্য পার্থর অজানা নয়। কিছু কিছু ডাক্তার এইসব দালালের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, সেটাও সে জানে। দালালরা টাকা নিয়ে রোগীকে বেড পাইয়ে দেয়, যে কোনও টেস্ট কিংবা অপারেশানের তারিখ এগিয়ে আনে ; হার্টের অপারেশানের

ক্ষেত্রে নিজেদের কোম্পানির কমদামি পেসমেকার রোগীর বুকে বসিয়ে বেশি টাকা আদায় করে। অপারেশানকারী ডাক্তারকে তার হিস্যাও দেয়। মায়ের অপারেশানের ক্ষেত্রে তেমনই কোনও দালাল চক্রের ছায়া আছে সম্ভবত - বুঝতে পারল পার্থ।

এমনিতে অত টাকা জোগাড় করা তাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। এদিকে-ওদিকে ধার করে যদিও কিছু জোগাড় করা যায়, তা চলে যাবে দালাল আর দালালদের পৃষ্ঠপোষক এক ডাক্তারের হাতে - এটা মেনে নেওয়া অসম্ভব পার্থের পক্ষে।

সে তাই একে ওকে জিজ্ঞাসা করে চলে গেল সুপারের রুমের সামনে।

- একটু আসব স্যার ?

কী একটা ফাইল দেখছিলেন সুপার। মুখ না তুলেই বললেন, আসুন।

ভিতরে ঢুকে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল পার্থ। হাতের কাজটা না সারা পর্যন্ত কিছু বলা উচিত হবে কি না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল।

একটু বাদে হাতের কাজ সেরে, সেই ফাইলটা সরিয়ে রেখে, আরেকটা ফাইল টেনে নেবার ফাঁকে মুখ খুললেন সুপার, বলুন।

- একটা কথা ছিল স্যার। একটা অভিযোগ আছে।

এবার মুখ তুলে তাকালেন সুপার। তারপর কী ভেবে চেয়ার দেখিয়ে বললেন, বসুন।

পার্থ বসলে আবার বললেন, হ্যাঁ, কী বলছিলেন যেন ?

- আমার মা খুব অসুস্থ স্যার। ব্রেন টিউমার।

- তা আমার কাছে কেন ? আউটডোরে যান। আউটডোরে গিয়ে দেখান !

- না স্যার। খুব ইমারজেন্সি কেস। খুব যন্ত্রণা হচ্ছিল। ব্রেন টিউমার তো !

- আরে বাবা, সে না হয় বুঝলাম। তার জন্যে তো ইমারজেন্সিও আছে।

- ইমারজেন্সিতেই এনেছিলাম স্যার। অ্যাডমিশানও হয়ে গেছে।

- ব্যাস, তা হলে তো হয়েই গেল ! আমাদের ডাক্তাররা আছেন। কী করতে হবে না হবে তাঁরাই সব করবেন এবার। আর কী ?

- সমস্যা সেখানে না স্যার। স্ক্যানও করা হয়ে গেছে। ডাক্তারবাবু বলেছেন অপারেশান করাতে হবে ইমিডিয়েটলি। কিন্তু ডেটটা এত পিছিয়ে যাচ্ছে যে...। তারপরে আবার ঘুষ চাইছে একজন।

- ঘুষ !

- হ্যাঁ, স্যার। অপারেশান করাতে গেলে নাকি দশ হাজার টাকা দিতেই হবে। তাতে নাকি ডেটও আগে করে দেবে ওরা।

- কারা ? কাদের কথা বলছেন আপনি ? তারা কি এই হসপিটালের স্টাফ ?

- সেটা বলতে পারব না। তবে সে ডাক্তারের সঙ্গে সঙ্গেই ওয়ার্ডে ঘুরছিল।

- আপনি তার নাম জানেন ?

- না।

- তাকে দেখলে চিনবেন ?

পার্থ ভেবে দেখল, সে যদিও লোকটাকে দেখেনি, তবু মার্ক করা হয়ত কঠিন হবে

না। কারণ শান্তা আর কোয়েল লোকটাকে দেখেছে। তাই সে বলল, চিনব হয়তো।

ভদ্রলোক গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ালেন।

- আপনি এক কাজ করুন, পেসেন্টের নাম, ওয়ার্ড, বেড নম্বর - এসব লিখে আমার কাছে একটা অ্যাপ্লিকেশান জমা দিয়ে যান। আমি দেখব ব্যাপারটা।

- থ্যাঙ্ক ইউ স্যার। থ্যাঙ্ক ইউ। আমি এখনই দিয়ে যাচ্ছি। - বলে কাগজ-কলম জোগাড় করবার জন্যে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েও পার্থ ফিরল আবার, স্যার।

- আবার কী ?

- আরেকটা কথা স্যার। অপারেশান যদি হয় তার ওষুধ, খরচ-খরচা...। সব মিলিয়ে অনেক টাকার ধাক্কা। আমাদের অবস্থা এমন হয় যে, অতগুলো টাকা খুব সহজে দিতে পারব। এদিকটাও যদি একটু ভাবেন স্যার।

কী বুঝলেন ভদ্রলোক কে জানে ! বললেন, দেখব, সেটাও দেখব। আপনি আগে অ্যাপ্লিকেশানটা তো লিখে আনুন !

শেষ পর্যন্ত ব্যবস্থা একটা হয়েই গেল। নীলরতনেই। তবে অপারেশনের ডেটটা এগিয়ে আনা যায়নি। তার জন্যে অবশ্য দায়ী নয় হাসপাতালের কেউ-ই। আসলে পার্থর মায়ের হার্টের অবস্থা ততটা ভালো নয়। কিছুদিন বিশ্রাম প্রয়োজন। ততদিন

মনোরমাকে হাসপাতালেই থাকতে হবে।

কথা রেখেছেন সুপার। তাঁর পরামর্শ মতো এলাকার কাউন্সিলার মোহিত ভট্টাচার্যের কাছ থেকে একটা ইনকামিং সার্টিফিকেট এনে জমা দিয়েছিল পার্থ। তার পরিপ্রেক্ষিতে সব কিছু ফ্রি-তেই হবে। দু'টো একটা ওষুধ, যা হাসপাতালে পাওয়া যাবে না, সেগুলোই শুধু কিনে দিতে হবে নিজেদের। - এসব বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন সুপার নিজেই।

মনোরমা এখন ডাক্তারদের চেক আপে রয়েছেন। থাকবেন আরও কয়েকদিন।

সকালে বিকালে কখনও ভাগাভাগি করে মাকে দেখে আসে শান্তা আর কোয়েল, কখনও দু'জনে একসঙ্গে যায়। এখানেই কোয়েলের মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। আগে পার্থ তাকে নিয়ে মিলেনিয়াম পার্ক কিংবা ইডেন গার্ডেন কিংবা ভিক্টোরিয়া বা অন্য কোথাও ঘুরতে যাবার কথা বললে বেশির ভাগ দিনই - পড়ার ক্ষতি হবে - এই ছুতো দিয়ে এড়িয়ে যেত কোয়েল। বলত, মশাই, তোমার সাথে ঘুরে বেড়াবার সময় সারাজীবনে অনেকই পাব। কিন্তু পড়াশুনোটা, অনার্সটা তো আর আমার-তোমার জন্যে থেমে থাকবে না ? - ফিজিক্সে অনার্স নিয়েছে কোয়েল। স্বাভাবিকভাবে পড়াশুনার চাপটাও বেশি। অথচ এই যে এখন হাসপাতালে যাচ্ছে আসছে, এতে পড়াশুনার নিশ্চয় ক্ষতি হচ্ছে ; তবু কই, সেই ক্ষতির কথা তো এখন একবারও সে ভাবছে না ! কর্তব্য বোধ ? নাকি ভিতরের টান ? বিশেষত মেয়েদের মধ্যে এই পরিবর্তনটা কেন আসে কে জানে !

পিয়ালকে নিয়ে বাবাও যান মাঝে মাঝে। কোনওদিন অফিস কামাই করে, কোনওদিন ছুটি-ছাটায়। আত্মীয়স্বজন কি পাড়ার পরিচিত জনদেরও কেউ কেউ যায়। গিয়ে রোগীকে দেখে আসে, সান্ত্বনা দেয়, ভরসা জোগায়। নন্তুও হাসপাতালে গেছিল একবার। জীবন, দিব্য, অর্জুনরা আরেক দিন। আর পার্থ নিজে সকালে পারলে সকালে, বিকেলে পারলে বিকেলে গিয়ে মাকে দেখে আসে। এ ব্যাপারে কমলদা তাকে কিছুটা ছাড় দিয়েছেন। যেদিন খেলা থাকে, সেদিন অবশ্য আর হাসপাতালে মাকে দেখতে যাওয়া হয়ে ওঠে না পার্থর। মনটাই শুধু ছুটে যায় মায়ের কাছে। গিয়ে বলে, আমি এসেছি মা। আজও এসেছি।

এর মধ্যে কার কাছে যেন খবর পেয়ে হাসপাতালে একবার এসেছিলেন মাখনদা। ইলিয়াস-সুখেনরাও এসেছিল একদিন।

ওদিকে লিগের খেলা গড়িয়েছে অনেকদূর। বেশ কতকগুলো ম্যাচে হেরে, কতকগুলোয় ড্র করে এবং জিতে অভিযান ক্লাবের অবস্থা এখন তথৈবচ। ইলিয়াস যদিও মাঠে নামছে এখন, তবুও সুবিধা বিশেষ একটা হচ্ছে না। আগের সেই ফর্ম অনেকটাই হারিয়ে ফেলেছে সে। এ পর্যন্ত গোল করেছে মাত্র একটা। সেদিক দিয়ে পার্থই খানিকটা এগিয়ে। পাঁচ-পাঁচটা গোল তার ঝুলিতে। ক্লাব অবশ্য পয়েন্ট পেয়েছে চোদ্দ। বাকি শুধু সবুজ সংঘের সঙ্গে খেলাটা। উয়াড়ী সব ক'টা খেলা শেষ করে সবুজ সংঘের থেকে মাত্র দুই পয়েন্টে এগিয়ে। সেই হিসাবে সুপার ডিভিশনে যাবার সম্ভাবনা পঞ্চাশ পঞ্চাশ। সবুজ সংঘ যদি কোনওক্রমে শেষ ম্যাচটা জিতে তিনটে পয়েন্ট পেয়ে যায়, তা হলে উয়াড়ী নয়, সুপার ডিভিশনে চলে যাবে ওই সবুজ সংঘই। মাখনদা এসেছিলেন সেসব কথা বলতেও। যাবার সময় বলে গেছেন শেষ ম্যাচটাতে পার্থ আর ইলিয়াসকে ভালো খেলতেই হবে। শুধু ভালো খেলাই না, গোলও করতে হবে। তা যদি পারে, তা হলে দু'জনেরই মহামেডানে যাবার একটা চান্স হতে পারে। হয়তো বা চাকরিও একটা মিলে যেতে পারে।

পার্থর স্বপ্ন তো সেটাই। চাকরি পেয়ে মাকে খুব বড় ডাক্তার দেখিয়ে কিংবা ভেলোরে নিয়ে গিয়ে সারিয়ে তোলা, বাবার মুখে হাসি ফোটানো, শান্তার বিয়ে দেওয়া আর সব শেষে কোয়েলকে...। - স্বপ্নের এই দৃশ্যগুলো যেন ধারাবাহিকভাবে দাঁড়িয়ে আছে। মনের ভিতর থেকে উঠে আসা এইসব দৃশ্য তবু কেন যে হঠাৎ হঠাৎ করে হারিয়ে যায়!

আজ বৃহস্পতিবার। মায়ের অপারেশন হবে আজই দুপুরে। পার্থ মানসিকভাবে তৈরি হচ্ছিল। বাড়ির অন্যান্যরাও তাই।

এমনিতে আজ অফ ডে পার্থর। অফ ডে না হলেও অবশ্য কিছু যেত আসত না। মায়ের অত বড় একটা অপারেশনের দিনে মাঠে তাদের খেলা থাকলেও সে সেখানে যেত নাকি ? মা তার কাছে আগে, না খেলা আগে।

অফিস থেকে বোধ হয়, ক'দিন ছুটি নিয়েছেন বাবা। এ বাড়ির সবার ছোট যে পিয়াল, ওরও বোধ হয় আজ স্কুলে যাওয়া বন্ধ। জানা কথা, আজ আর কেউ ওকে বকাবকি করবে না। মা তিনজনেরই মা যখন, তখন বয়সে বড় পার্থ আর শান্তার সঙ্গে অধিকারের প্রশ্নে ছোট পিয়ালের কোনও পার্থক্য নেই। থাকেও না।

বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে টেনশনের মাত্রাটাও যেন বাড়ছে। আর কত ঘন্টা ? কত ? ভালোয় ভালোয় সব কিছু মিটে যাবে তো ?

গতকাল রাতে টেনশনের জন্যেই চোখে ঘুম আসেনি পার্থর। সারারাত চোখের পাতা এক করতে পারেনি। মায়ের কথাই ভেবেছে কেবল। সারারাত। অনেকটা স্মৃতিচারণের ভঙ্গিতে, 'মা, দ্যাখো, সেই কোন ছোট্টবেলা থেকে তুমি রয়ে গেছ আমার বাস্তবে, স্বপ্নে, আমার মজ্জায় মজ্জায়। তোমাকে কি ভোলা যায় মা ? হে মাকালী, হে বাবা তারকনাথ, ভালো করে দাও আমার মাকে। ভালো করে দাও...' ঘরের মধ্যে, বারান্দায় কখনও পায়চারি করতে করতে বিড়বিড় করেছে।

পার্থর তবু বার বার আশঙ্কা জেগেছে, মা যদি হাসপাতাল থেকে আর ফিরে না আসে ?

বাবাও কি গতকাল রাতে ঘুমোতে পেরেছেন ? কিংবা শান্তা ? মনে হয় না।

আজ সকাল থেকেই বাবার টেনশানের মাত্রাটা বার বার ধরা পড়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে কী যেন বলবেন বলে পার্থকে ডেকেও বলার কথাটা ভুলে গেছেন দু-দুবার। চশমা হারিয়েছেন একবার। এখন খবরের কাগজ নিয়ে বসেছেন। তাতে মন বসাবার চেষ্টা

করছেন।

পার্থ বাথরুমে গেছিল। স্পষ্ট শুনতে পেল বাবা একসময় আর্তনাদ করে উঠলেন, শান্তা শিগ্‌গির এদিকে আয়। দ্যাখ কী লিখেছে পেপারে।

শান্তা বোধহয় রান্নাঘরে ছিল। দৌড়ে চলে এল তখনই, কী, কী হয়েছে বাবা ? কী হয়েছে ?

পার্থও তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ল বাথরুম থেকে।

বাবা হাতের কাগজের এক জায়গায় আঙুল রেখে বললেন, এই দ্যাখ কী লিখেছে। হাসপাতালের জুনিয়ার ডাক্তাররা না কি ধর্মঘট ডেকেছে আজ থেকে !

- ও মা, সে কী ! কী হবে এখন ? ভয়ে-দুশ্চিন্তায় কেঁদে ফেলল শান্তা।

ভয় পেয়ে গেল পার্থও। জুনিয়ার ডাক্তারদের ধর্মঘট মানে কি হাসপাতালের সব কাজ বন্ধ থাকবে ? মায়ের অপারেশনও ?

বাবা খবরটা পড়ে শোনাচ্ছেন ওদের। যার সারমর্ম এই - হাসপাতালের ইচ্ছাকৃত অবহেলায় অর্থাৎ ডাক্তার-নার্সদের গাফিলতিতে এক চোদ্দ বছরের কিশোরের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে, উত্তেজিত অভিভাবক এবং তার বাড়ির কয়েকজন অভিযুক্ত ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলতে যায়। সেই ডাক্তার উল্টে সবার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে বসেন। স্বাভাবিকভাবে উত্তেজিত জনতা ওই ডাক্তারকে খানিকটা হেনস্তা করে। জুনিয়ার ডাক্তাররা তখন একজোট হয়ে আক্রমণ করে বসে জনতাকেই। এখন পুরো ঘটনার রং পাল্টে দেবার জন্যে বার বার আক্রান্ত হবার অভিযোগ তুলে অনির্দিষ্টকালের জন্যে কর্মবিরতি ঘোষণা করেছে জুনিয়ার ডাক্তাররা।

শান্তা তখনও কাঁদছে দেখে বাবা বললেন, দাঁড়া, দাঁড়া। কাঁদিসনে। মাথা ঠাণ্ডা রাখ। এখানে যা লিখেছে - তাতে, কর্মবিরতি বলতে তো জুনিয়ার ডাক্তারদের কর্মবিরতি। সিনিয়ার ডাক্তারদের তো না। আগে হাসপাতালে যা কেউ। খোঁজ নিয়ে দ্যাখ,

অপারেশনটা হয়তো করবে। ডেট দিয়েছে যখন, তখন কী আর চুপচাপ বসে থাকবে ডাক্তাররা ?

পার্থই খোঁজ নিতে গেল হাসপাতালে।

গেটের মুখে অনেক লোক। পুলিশও এসেছে। ভিতরে জুনিয়ার ডাক্তারদের অবস্থান বিক্ষোভ চলছে।

পুলিশকে সামলে, আরও কয়েকজনকে সামলে কোনওরকমে ভিতরে ঢুকে সুপারের ঘরের সামনে আসতে পারলেও তাঁর দেখা পার্থ পেল না। অপারেশন করবেন যিনি, সেই ডাঃ চৌধুরিরও খোঁজ পাওয়া গেল না কোথাও। হয়তো আসেননি আজ।

পার্থ তবু হাল ছেড়ে দিতে চাইল না। ডাঃ চৌধুরি না আসুন, নিশ্চয় অন্য কেউ অপারেশনটা করবেন। মানুষের জীবন নিয়ে তো ছেলেখেলা চলে না !

এখানে-ওখানে নানান জায়গায় দৌড়ে দৌড়ে বেড়াল সে। কেউ সঠিক খবরটা দিতে পারছে না। কয়েকজন সিনিয়ার ডাক্তার তো একরকম তাড়িয়েই দিলেন, যান, যান এখান থেকে !

পার্থ প্রতিবাদ পর্যন্ত করতে পারেনি। স্রেফ ভয়ে। রেগে গিয়ে ডাক্তাররা যদি মায়ের চিকিৎসায় গাফিলতি করেন কিংবা অপারেশনটা না করেন !

শেষে দয়া পাওয়া গেল এক জুনিয়ার ডাক্তারের কাছে। তার অল্প বয়স। বিপ্লবের জ্ঞানটাও প্রখর। সব শুনে বলল, আপনার কি মাথা খারাপ ? এমন দিনে অপারেশন হয় কখনও !

অপারেশনটা যে তাড়াতাড়ি করা দরকার এবং সে মন্তব্য যে ডাক্তারদেরই - তা-ও জানাল পার্থ। তবু শুনতে হল, আজ তো দূরের কথা, দিন কয়েকের মধ্যেও অপারেশনটা হবার কোনও চান্স নেই। কারণ এ কর্মবিরতি অনির্দিষ্টকালের। তাছাড়া জুনিয়ারদের পাশে সিনিয়ার ডাক্তাররাও না থেকেও আছেন। থাকবেনও। অতএব

কোনও আশা নেই।

সেই ডাক্তারই আপনজনের মতো ভালো পরামর্শ দিল একটা, আমার পরামর্শ যদি মানেন তো বলব, এখানে ফেলে রেখে কী লাভ ? পেসেন্টকে বাড়িতে নিয়ে ডাক্তার দেখান গিয়ে কিংবা কোনও নার্সিংহোমে ভর্তি করিয়ে দিন গিয়ে। বেঁচে যাবে।

- অন্য কোনও হাসপাতালে নিয়ে গেলে হয় না ?

- হ্যাঁ, তা-ও করতে পারেন। আর.জি.কর কিংবা এস.এস.কে.এমে নিয়ে যান। মোটকথা এখানে ফেলে রাখা ফালতু। অবশ্য অনির্দিষ্টকাল যদি এখানে অপেক্ষা করতে চান, তা হলে আমার কিছু বলার নেই।

আজ শেষ ম্যাচ। সবুজ সংঘের সঙ্গে অভিযান ক্লাবের। ফিরতি লিগের এই খেলার ফলাফল কী হতে পারে, তা নিয়ে আগে থেকেই জল্পনা-কল্পনা চলছিল ক্লাবের সদস্য ও সমর্থকদের মধ্যে। পারবে কি অভিযান ? পারবে কি ?

জিতলেও অবশ্য বিশেষ একটা লাভ নেই অভিযান ক্লাবের। চ্যাম্পিয়ান তো হতে পারবেই না, হারলেও ক্ষতির পরিমাণ প্রায় শূন্য। তবে অভিযানের হারা ও জেতার সঙ্গে অন্য দু'টো দলের ভাগ্য ঝুলে আছে বেশ ভালোভাবেই। উয়াড়ী আর সবুজ সংঘের সেই ভাগ্য-বিচারে এই শেষ খেলায় যদি অভিযান ক্লাব জিতে যায়, তাহলে

চ্যাম্পিয়ান হয়ে সুপার ডিভিশনে যাবে উয়াড়ী। কিন্তু সবুজ সংঘ জিতে গেলে পয়েন্টের পার্থক্যে উয়াড়ীকে টপকে যাবে সবুজ সংঘ।

পার্থ অবশ্য ঠিক করে নিয়েছে প্রথমবারের খেলায় ড্র হলেও ভালো খেলে সবুজ সংঘকে এবার সে হারাবেই হারাবে। সে তো আর একা নেই। খোদ ইলিয়াস থাকছে পাশে। দু'জনের সম্মিলিত আক্রমণ কতক্ষণ সামলাবে সবুজ সংঘের ডিফেন্স, কতক্ষণ ? ওদের ডিফেন্স তছনছ করে দেবেই পার্থ। কেননা তখন গ্যালারিতে বসে খেলা দেখবেন যে স্বয়ং মাখনদা !

নিজেদের মাঠে খেলার ভালো রকমেরই সুবিধা আছে। এমনিতে চেনা মাঠ। তার উপর সমর্থকও বেশি। সেই সুবিধা পেয়ে গেল সবুজ সংঘ। প্রথম থেকেই। সমর্থকরা চিৎকার করে দলকে উৎসাহ জোগাতে লাগল। সেই উৎসাহেই হোক আর জেতার ইচ্ছেতেই হোক, শুরুটা সবুজ সংঘ খারাপ করল না।

কিন্তু আক্রান্ত হতে হতে একসময় আর ধরে রাখতে পারল না নিজেদেরকে। মেজাজ হারিয়ে ফেলল। রেফারি তেমন একটা কড়া ধাতের মানুষ নন। তবু হলুদ কার্ড দেখল চারজন। তার পরেও বুট চালাতে লাগল ওরা। মানুষ মরিয়া হয়ে উঠলে সব শাসনই ঠুনকো হয়ে পড়ে। সবুজ সংঘেরও হল তাই। ইলিয়াস প্রায় মাঝ মাঠ থেকে

বল নিয়ে খানিকটা একার চেষ্টায় ওদের ডিফেন্সের বেড়াজাল ছিড়ে ঢুকে পড়েছিল পেনাল্টি বক্সের মধ্যে। বিশ্রীভাবে পা চালিয়ে তাকে ফেলে দিল সবুজ সংঘের হাফ ব্যাক প্রলয় মিত্র। লাল কার্ড না দেখিয়ে আর উপায় ছিল না রেফারি মৃণাল দাসের। আর তাতেই প্রলয় কাণ্ড। রেফারির সঙ্গে এক প্রস্থ কথা কাটাকাটি এবং খেলোয়াড়দের মধ্যে হাতাহাতিও হল। সেই উত্তেজনা ছড়াল গ্যালারিতেও।

পুলিশ এসে যদিও অবস্থাটা সামাল দিল, খেলাও শুরু হল আবার, ততক্ষণে অবশ্য অভিযান ক্লাবের ছন্দটা কেটে গেছে। আগের মতো সেই আগ্রাসীভাব উধাও। শুধু যেন ডিফেন্স আগলে বসে রইল।

প্রথমার্ধে কোনও দিকেই কোনো গোল হল না।

বিরতির পর কমলদা এক জায়গায় জড়ো করালেন সবাইকে।

তোমাদের সাথে আমার কিছু কথা আছে। সেটা বলার জন্যেই সবাইকে ডেকেছি।

- বলুন। সবার হয়ে ইলিয়াসই বলল আগ বাড়িয়ে।

- বলব। তবে তার আগে আমাকে কথা দিতে হবে আমি যা বলব, যা তোমরা শুনবে - সব গোপন রাখবে। কেউ কোথাও মুখ খুলবে না।

ইলিয়াসরা এ ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে দেখে যেন ওদের ভুল ভাঙাতেই কমলদা বললেন, তার মানে এই না যে আমি তোমাদের চুরি-ডাকাতি করতে বলব। আমার বক্তব্য খেলা নিয়েই। - কথাটা হল, শুধু আমি কেন, আমরা সবাই জানি এই মুহূর্তে অভিযানের পজিশন কোথায়। কি, জানি কি না ?

পার্থ-ইলিয়াসদের কে না জানে সে কথা ? তবু চুপ করে রইল সবাই।

মৌনতা সম্মতির লক্ষণ ধরে নিয়ে কমলদা বলে চললেন, হ্যাঁ, আমরা সকলেই জানি। আবার এ-ও জানি যে ভালো খেলে জিতে গেলেও বিশেষ একটা লাভ আমাদের

হবে না। এই অবস্থায় নিশ্চয় আমাদের ভাবা উচিত, আমরা কী করব।

পার্থ বুঝতে পারল না ঠিক কী বলতে চাইছেন কমলদা। অন্যদেরও সেই অবস্থা।

- তোমরা জানো প্রথম ডিভিশনে দু'টো দল এখন ভালো পজিশনে আছে। উয়াড়ী আর সবুজ সংঘ। আমাদের উচিত এই দু'টো দলের যে কোনও একটাকে সমর্থন করা। কিন্তু উয়াড়ীকে সমর্থন করা আমাদের পক্ষে ঠিক হবে না। কারণ লিগের প্রথম খেলাতেই ওরা আমাদের হারিয়ে দিয়েছিল। আমরা তাই সমর্থন করব সবুজ সংঘকে।

সমর্থন ! তা-ও সবুজ সংঘকে, যার সঙ্গে আজ খেলা চলছে ! অবাক হয়ে গেল পার্থ। কী বলতে চাইছেন কমলদা ?

সে জানতে চাইল, কীভাবে ?

- সে নানানভাবেই হতে পারে।

- যেমন ?

- যেমন ধরো আমরা ভালো খেলব, ভালো খেলতে তো আর দোষ নেই, কিন্তু গোলের জন্যে ঝাঁপাব না। একটু-আধটু ডিফেন্সিভ খেলতেই পারি।

ঘৃণায় চোখ-মুখ কুঁচকে গেল পার্থর।

- তার মানে আপনি গটআপ ম্যাচ খেলতে বলছেন !

- গটআপ ! একে তুমি গটআপ বলছ ? বরং কম্প্রোমাইজ বলো।

এবার ফুঁসে উঠল ইলিয়াস, গটআপ নয় তো কী ? এটুকু বোঝার ক্ষমতা তো আমাদের হয়েছে। তাছাড়া বুঝতেই পারছি না এতে আমাদের লাভ কী ? উয়াড়ীর ওপরে প্রতিশোধ নিতে গিয়ে ইচ্ছে হারব !

- দু-এক গোলে হারকে হার বলে না। তাছাড়া আমাদের হারলেও কী, জিতলেও কী ?

- এখানেই তো মাখনদার সাথে আপনার পার্থক্য। আপনার জায়গায় মাখনদা থাকলে কখনও এ কথা মুখেও আনতেন না। বরং বলতেন, যা, জিতে আয়। জিতে আসাটাই ফুটবলারদের প্রধান লক্ষ্য।

- তাই নাকি ? উনি এত কিছু জানতেন ? উয়াড়ীর কাছে তা হলে অমনভবে ক্লাব হেরেছিল কেন বুঝতে পারছি না। এত জানতেন আর দলকে কীভাবে জেতাতে হয় তা জানতেন না ? স্ট্রেঞ্জ !

- মাখনদার সম্পর্কে আর একটা শব্দও উচ্চারণ করবেন না আপনি। সেটা কিন্তু আমরা মেনে নেব না। - সটান উঠে দাঁড়িয়ে বলে বসল পার্থ।

কমলদা ফিরে তাকালেন তার দিকে।

- কে ? ও, ক্যাপ্টেন ? তা-ও তো বটে। তোমরা তো আবার মাখনদাকে...। যাকগে, যা বলার ছিল বলে দিয়েছি। তোমরা কী করবে না করবে সে তোমাদের সিদ্ধান্ত। তবে হ্যাঁ, একটা কথা শুনে রাখো, দু-একজন রাজি না-ও থাকতে পারো তাতে আমার কিছু যায় আসে না।

- মানুদা এসব জানেন ?

- মানুদা ? তাঁর কাছে নালিশ করবে ? - অদ্ভুতভাবে হাসলেন কমলদা, করে দ্যাখো। আমার কোনও আপত্তি নেই।

একজন কোচের হাতে ম্যাচের রাশ টেনে ধরার মতো কত বড় যে অস্ত্র থাকে, খেলার মাঠেই তা দেখতে পেল পার্থ-ইলিয়াসরা।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকে ঝড়ের গতিতে একের পর এক আক্রমণ শাণাতে আরম্ভ করেছিল ইলিয়াস-পার্থ-সুখেন। তার মধ্যে অনেক বেশি আক্রমণাত্মক দেখাচ্ছিল ইলিয়াসকে। একবার তো তার জোরাল শট গোল পোস্টে লেগে ফিরেও গেল। দ্বিতীয়বার সবুজ সংঘের খেলোয়াড়দের বোকা বানিয়ে এগিয়ে গিয়েও শট নেবার মুহূর্তে তরুণ সাহা অফসাইট করে বসল। তৃতীয় বারে অফসাইট করল আদিত্য, একেবারেই অবিবেচকের মতো। ঘাড়ের উপরে দু-দু'টো মার্কার নিয়েও গোলের সুযোগ তৈরি করা কী যে কষ্টকর কাজ তা তো ভালোভাবেই জানে ইলিয়াস। তাই ক্রমাগত ব্যর্থতায় মেজাজ হারাল সে। হলুদ কার্ডও দেখতে হল তাকে। কমলদা যেন এমন কোনও সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিলেন। ইলিয়াসকে তুলে নিয়ে নামালেন ডিফেন্সের গৌরাঙ্গকে। ফল যা হবার হলও তাই।

অভিযানের খেলার গতি মন্থর হতেই একটু একটু করে খেলাটা ধরে নিল সবুজ সংঘ। এবং অচিরেই অভিযানের ডিফেন্সের জাল ছিড়ে, গোলকিপার জগন্নাথকে প্রায় দাঁড় করিয়ে, জালে বল জড়িয়ে দিয়ে গেল এস. থাপা।

বেশি গোলে হারলে সম্মান যেতে পারে - বোধ হয় এই ভয়েই আলি রাজাকে তুলে পলাশকে নামালেন কমলদা। পলাশ ডিফেন্সের অভিজ্ঞ খেলোয়াড়। সুতরাং তার মাঠে নামাতে অভিযানের গোল পোস্টে আবার বল ঢোকার সম্ভাবনা যে কমবে, তাতে আর আশ্চর্য কী ?

খেলা ক্রমশ শেষ হয়ে আসছিল। যত সময় গড়াচ্ছে, পার্থর টেনশন বাড়ছে ততই। হাতে আর মাত্র কয়েক মিনিট। তার মধ্যে যা করার করতে হবে। আজ যদিও তাকে গেম মেকার হিসাবে খেলতে বলা হয়েছে ; কিন্তু তার মানে তো এই নয় যে, সুযোগ পেলে সে গোল দিতে পারবে না।

সুযোগ খুঁজতে লাগল সে।

সবুজ সংঘ আরও গোলের জন্য ঝাঁপাচ্ছে। ছেলেখেলা করতে চাইছে বিপক্ষকে নিয়ে।

পার্থ লক্ষ করল সবুজ সংঘের ফুটবলাররা যখন আক্রমণে উঠে আসছে, তখন পিছনে ফাঁকা থেকে যাচ্ছে কিছুটা জায়গা। কেউ ভাবেইনি ওই ফাঁকটুকুকে বিপদে পরিণত করবে অভিযান ক্লাবের কোনও খেলোয়াড়।

ফাল্গুনি সিংহের পা থেকে বল ক্লিয়ার করতে গিয়ে এলোপাথাড়ি একটা শট নিয়েছিল আদিত্য। পার্থকে পাস করার কোনও উদ্দেশ্যই তার ছিল না। তবু বলটা পেয়ে গেল সে। পেয়েই শুরু করল বল নিয়ে জীবনের দ্রুততম দৌড়টা।

মাঠের দর্শকরা অবাক চোখে দেখছে, অভিযান ক্লাবের দশ নাম্বার জার্সিধারী বল নিয়ে দৌড়চ্ছে। তার গতি আর স্কিলের কাছে হার মেনে একের পর এক ছিটকে যাচ্ছে বিপক্ষদলের ফুটবলার।

ওই তো দশ নাম্বারের ছেলেটা পেনাল্টি বক্সের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। এখন সামনে শুধুই গোলকিপার।

হ্যাঁ, এবার ডাইনে-বাঁয়ে দুলকি দিচ্ছে। গোলকিপারকে ধাঁধায় ফেলছে। ওদিকে পিছন দিক থেকে ছুটে আসছে ক'জন ফুটবলার।

আহ্, দেরি করছে কেন ছেলেটা ! না, ওই তো বাঁদিকে টার্গেট নিয়ে ডান দিকে শট নিল। ব্যস, গো -- ও -- ল --। সহর্ষে ফেটে পড়ল গ্যালারির একটা অংশ।

পার্থও অভ্যাস মতো দু'হাতের তর্জনী উঁচিয়ে দৌড় লাগাল মাঝ মাঠের দিকে। সুখেন-জগন্নাথরা দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরল তাকে। আদিত্য-মলয়রা যে যেখানে ছিল দাঁড়িয়ে রইল সেখানেই।

মাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা কমলদার মুখ শুকিয়ে গেছে। উত্তেজনায় ছটফট করছেন তিনি আর গলা ফাটাচ্ছেন, নীচে নাম, নীচে --।

মিনিট তিনেকের মধ্যে আবার একটা সুযোগ পার্থর সামনে। সবুজ সংঘের স্টপার দীপেন তাদের যোসেফকে পাস করতে গিয়ে বল তুলে দিল সুখেনের পায়ে। সুখেন খানিকটা এগিয়ে লম্বা পাসে সেটা পৌঁছে দিল পার্থর কাছে।

পার্থ দৌড়াচ্ছে। প্রায় আগের মতোই একের পর এক ছিটকে যাচ্ছে সবুজ সংঘের ফুটবলার। তারা তবু আশা না ছেড়ে পিছন থেকে তীব্র গতিতে দৌড়ে আসছে।

তাদের গোল কিপার ভয়ে চেঁচাচ্ছে। চিৎকার করে উঠে আসতে বলছে সহ-খেলোয়াড়দের। বাধা দিতে বলছে অভিযানের দশ নাম্বার জার্সিধারীকে।

সামনে এবার বিপক্ষের দু'জন। পার্থ চেষ্টা করছে ওদের কাটিয়ে যাওয়ার। গেলও। দৌড়চ্ছে। দৌড়চ্ছে। এবার প্রায় নিশ্চিত গোল।

উত্তেজনায় চিৎকার করছে দর্শকরা।

গোল কিপার বল আটকাবার জন্যে তৈরি।

আরেকটু এগিয়ে গোলে শট নেবে পার্থ। এগোচ্ছে। ক্রমশ এগোচ্ছে।

হঠাৎ সবুজ সংঘের হাফ ব্যাক নীলাদ্রি বাঁদিক থেকে দৌড়ে এসে শূন্যে ভাসিয়ে দিল নিজেকে।

তারপরই দর্শকরা সবিস্ময়ে দেখল, একটু আগে যে দশ নাম্বার জার্সিধারী আশ্চর্যজনক একটা গোল দিয়েছে এবং আরও একটা দিতে যাচ্ছিল, সে পড়ে গেছে ; তলপেট চেপে ধরে যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গিয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে মাটিতে।

টানা তিন দিন অজ্ঞান থাকার পর জ্ঞান ফিরে আসছিল পার্থর। অজ্ঞান থাকা অবস্থায় যন্ত্রণার পাহাড়ও ঘুমিয়ে ছিল যেন। জ্ঞান ফেরার সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠতে লাগল সে-ও।

নার্স কাছেই ছিলেন। মৃদু গোঙানির আওয়াজ পেয়ে দ্রুত পায়ে এগিয়ে এলেন। ঝুঁকে পড়ে ডাকলেন, পার্থবাবু, শুনছেন ? পার্থবাবু ! ... তাকান, তাকান এদিকে।

কোনও উত্তর পাওয়া গেল না। কে দেবে উত্তর ? পার্থ তখন পাহাড়ের পর পাহাড় ডিঙিয়ে যাচ্ছে।

নার্স থেমে থেমে ডাকতে লাগলেন, পার্থবাবু ! ... পার্থবাবু !

খানিকক্ষণ বাদে পার্থর জ্ঞান ফিরে এল আবার। এদিকে ওদিকে তাকিয়েও জায়গাটা চিনতে পারল না সে।

- আমি কোথায় ?

- নার্সিংহোমে।

- নার্সিংহোম ! পার্থ অবাক হল। জানতে চাইল, কেন ?

- কিছু মনে পড়ছে না ?

উত্তরে মাথা নাড়াল পার্থ।

- কী হয়েছে আমার ?

- সে কী, এখনও মনে পড়ছে না ! বেশ, আমি খানিকটা মনে করিয়ে দেবার চেষ্টা করছি... । আপনি ফুটবল খেলছিলেন। খেলার মাঠে বল নিয়ে দৌড়তে দৌড়তে পড়ে গেলেন... কি, মনে পড়ছে ?

এবার একটু একটু করে সব মনে পড়তে লাগল পার্থর। প্রথমে চমৎকার একটা গোল। তারপর আরও একবার সুযোগ পেয়ে বল নিয়ে দৌড় --- দৌড় --- দৌড় -- দৌড় --। পাশ দিয়ে দ্রুত গতিতে সরে যাচ্ছে বাতাস। বিপক্ষের ফুটবলাররা ছিটকে যাচ্ছে একের পর এক। গোলকিপার আতঙ্কে ছটফট করছে। আরেকটা গোল হতে যাচ্ছে। আরেকটা...। কিন্তু ডান পায়ে কাট করে শট নেবার আগেই... আহ্... ! চারদিকটা আবার যেন অন্ধকার হয়ে আসছে। আবার।

পরদিন সকালে জ্ঞান ফিরে পেয়ে যেন রোজকার মতো সকালে ঘুম থেকে উঠছে, এমনভাবে উঠে পার্থ দেখল সে তখনও নার্সিংহোমেই শুয়ে আছে। আশেপাশে দাঁড়িয়ে অনেকগুলো চেনা মুখের মানুষ। ইলিয়াস, সুখেন, দেবাশিস, জগন্নাথ... মাখনদা !

মাখনদার দিকে চোখ পড়তেই কাছে এগিয়ে এলেন তিনি, কী রে পাগল, চিনতে পারিস ?

- মাখনদা...।

- হ্যাঁ। আমি।

- আমরা তোকে দেখতে এলাম। বলল জগন্নাথ।

সুখেন বলল, বাপ রে বাপ, এতদিন কেউ অজ্ঞান থাকে ! খেলি তো মোটে ওইটুকু একটা লাথি। আমি হলে দু'ঘন্টাতেই বিছানা ছেড়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠতাম।

পার্থ হাসল একটু।

হাসল ওরা সবাইও।

দেবাশিস বলল, সত্যিই খুব ভয় পাইয়ে দিয়েছিলি। ডাক্তারবাবু বলছিলেন, ওই অবস্থায় কোমায় চলে যাওয়া অসম্ভব কিছু ছিল না। শুনে অবধি ঠাকুরকে ডেকে

চলেছি তো ডেকেই চলেছি।

- তুই তো বেডে শুয়ে আছিস আর এরাও সেই থেকে পড়ে আছে এখানে। তাও একপ্রকার নাওয়া-খাওয়া ভুলে। আর ইলিয়াস ? তোর জন্যে খারাপ লাগবে কী, ওর মনের অবস্থা দেখে ওর জন্যেই বেশি খারাপ লাগছিল। হাসিমুখে বললেন মাখনদা।

পার্থ ইশারায় কাছে ডকল ইলিয়াসকে।

ইলিয়াস বেডের এক কোণায় বসে হাত রাখল পার্থর হাতে।

- আমাদের বাড়ি থেকে কেউ আসেনি ?

- হ্যাঁ, এসেছে। ওদিকে আছে। ডাক্তারের সাথে কথা বলছে বোধ হয়।

- ও।

খানিকক্ষণ চুপচাপ রইল পার্থ। কেন কে জানে একরাশ অভিমান তার মনের ভিতরে পর্দা তুলছে যেন। মনের ভাবটা লুকোতেই যেন সে জানতে চাইল, খেলার রেজাল্ট কী রে ?

- কী আবার হবে, যা হবার ছিল তাই হয়েছে। দুই -- এক।

সুখেন বলল, তুই মাঠ ছাড়ার পর আমাদের সবাই কেমন যেন দাঁড়িয়ে গেছিল। মোটেই খেলতে পারছিল না। আমারও একই অবস্থা। ওভাবে কখনও জেতা যায় ?

মাখনদা বললেন, যে খেলার ফলাফল খেলার আগেই নির্ধারিত হয়ে গেছিল, তাতে তো তোদের জেতার কথা-ই না, পার্থ।

পার্থ দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল হঠাৎ, আমি হেরে গেছি মাখনদা ! - হেরে গেছি।

- হেরে গেছিস মানে ? একপ্রকার ধমকে উঠলেন মাখনদা, কে বলেছে তুই হেরে গেছিস ? সবুজ সংঘ আর অভিযান ক্লাবের ওই ম্যাচটার কথা সবাই হয়তো একদিন ভুলে যাবে। কিন্তু তোর ওই যে আশ্চর্য একখানা গোল, ওই গোলটা যারা সেদিন দেখেছে, তারা কি তোকে কোনওদিন ভুলতে পারবে ? না, পারবে না। সেখানেই তো তোর জয় রে, সেখানেই তো তুই জিতে গেছিস !

পার্থর ব্যথা ভরা মুখটাতে আস্তে আস্তে অন্ধকার সরে গিয়ে একটা উজ্জ্বলতার ভাব ফুটে উঠতে লাগল। মাখনদার কথায় সান্ত্বনা খুঁজে পেয়ে এদিকে ফিরে চোখ মুছল সে।

মাখনদা কিন্তু খোলা জানালার দিকে সরে গেলেন। আসলে চোখের জল লুকোতে চাইলেন আড়ালে এসে। মনে মনে বললেন, জিতে গেছিস ঠিকই, পার্থ। কিন্তু সে শুধু মাঠের খেলায়। জীবনের খেলা যেখানে, সেখানে তুই হেরে গেছিস রে, বড় করুণভাবে হেরে গেছিস। তোর এই শারীরিক অবস্থায় আমি কী করে বলি, কাল বিকেলে এস.এস.কে.এমে নিয়ে যাবার পথে তোর মা মারা গেছে !

|| মূর্ছনার সৌজন্যে নির্মিত || ই-বুক ||

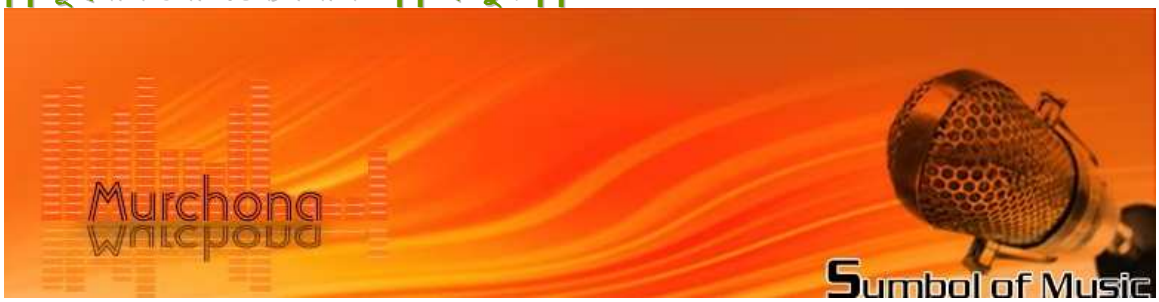

For More Books & Music Visit www.MurchOna.com
MurchOna Forum : http://www.murchona.com/forum
Suman_ahm@yahoo.com